মুস্কিল আসান

আশা দেবী

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

চিত্রশিল্পী
নরেন্দ্রনাথ মল্লিক

মুদ্রাকর:
দুলাল ভূঁঞা
শ্রীময়ী প্রিণ্টার্স
২৪ তারক প্রামাণিক রোড
কলকাতা ৬

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ লেখিকার আরও কয়েকটি বই ॥

ঘুমন্তি নদীর ঢেউ

লালতারা নীলতারা

খেয়াল খুশী

রক্তলিপি

রঙিন বেলুন

হাসির গল্প

কুট্টিপিসি এ্যাণ্ড কোং

নানা রঙের ফুল

মুস্কিল আসান

॥ সূচী ॥

সভাপতি বিভ্রাট

বকুলতলায় ইটের ওপর বসলে সেজমামার মনটা যেন কেমন কবি কবি হয়ে যায়। তখন তাঁকে সামলানোই শক্ত। আর এই কবি কবি ভাবই কেষ্টার সব রকম ভয়ের কারণ, কাজে সে অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করেছে। আজ হঠাৎ সেজমামার দুপুরবেলা এরকম ভাব হতে পারে বিবেচনা করেই কেষ্টা পকেটে করে খানিকটা তেঁতুলের আচার রেখেছিল। সেজমামা ইঁট পেতে উদাস উদাসভাবে বসতেই সে তার হাতে তেঁতুলের আচারটুকু গুঁজে দিল। সেজমামা ওষুধের বড়ির মতো সেটুকু কোঁৎ করে গিলে ফেলে বললেন : তবে শোন ; বিখ্যাত হতে কি আমি চাই! কিন্তু সবাই মিলে আমাকে বিখ্যাত করে তবে ছাড়বে।

কেষ্টা একবার শুধু হাতখানা চেটে নিয়ে বললে : সবার বড় দায় পড়েছে তোমাকে বিখ্যাত করার—ফুঃ···

: তুই বিশ্বাস করছিস না তো—? ওরে রে অবিশ্বাসী কেষ্টা—ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র। তবে শ্রবণ কর। বোস, ওই ইঁটখানার ওপর শক্ত হয়ে। আর যদি আমার কথা না শুনিস তবে এই থান ইঁটখান—।

কেষ্টা একখানা ইঁট পেতে বসে পড়লো : তবে বলো।

: তুই জানিস্ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়। আমাদের পাড়ার ঘন্টিকাকাকে একবার সেই ভীষণ কামড় খেতে হলো। তখন বসন্তকাল। আর জানিস কেষ্টা, বসন্তকালটা খুব খারাপ— আর এ সময় খুব বেশী রকম বসন্ত হয় বলেই

বোধ হয় এর নাম বসন্তকাল ; আর এর যদি বসন্ত না হলো তবে হতে কতক্ষণ ? যাকগে, সেই বসন্তকালে একদিন আমাদের বাগানের চারিদিকে যখন অজস্র সাদা ফুল ফুটেছে—মানকচু গাছের গায়ে যখন শুঁয়ো পোকা হাটছে, কালো কালো কোট পরা দাঁড়কাকগুলো যখন ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বাসা বানাবার চেষ্টা করছে তখন একদিন ঘটিকাকা ভাবাবেগে সেইসই একখানা কবিতা লিখে ফেললেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে—আজ যে হইল কবিতার বেগ—

হবে কি না দুর্দমনীয়—ইত্যাদি

: অবশ্য দুর্দমনীয় যে হয়েছিল তা আমরা পরে টের পেলাম

: কিভাবে কাকে ধরে-পাকড়ে একটা কবিতা যেই প্রকাশিত হলো আর যান কোথায়। তিনি রাতারাতি কপি মানে কবি-শ্রেষ্ঠ কবিশ্বর আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে তাঁর সস্থানে বসিয়ে দিলাম। তিনি হলেন চিংড়ীপোতা গোরক্ষা সমিতির স্থায়ী সভাপতি। তারপর আর তাকে পায় কে ! যেখানে যত মিটিং সবার সভাপতি তিনি। নিখিল বঙ্গ মূষিক এবং গন্ধ মূষিক নিবারণী সমিতির একমাত্র সভাপতি। সনাতন বায়স-তোষিনী সমিতির তিনিই হলেন একমাত্র সভাপতি। আর মিটি করা—যাকে বলে হেস্তনেস্ত করে সভা করা, তাই করতে লাগলেন ! মনে আছে, একদিন তিনি তাঁর গোয়ালাকে বলেছিলেন—হে গোরক্ষক, আজ আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। গোয়ালা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিল . মাফ করবেন বাবু, আর আপনার বাড়ী দুধ দেব না।

একদিন হলো কি কাণ্ড, আমরা ঠিক করলাম মিটিং করব। প্রথমে ব্যায়ামবীর কুম্ভকর্ণ দাসকে অনুরোধ করা হলো। কারণ তিনি নিদ্রা-নিবারণী সম্পর্কে বড় বড় প্রবন্ধ লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। কাজেই আমরা ঠিক করলাম তাঁকেই সভাপতি করব। কিন্তু তিনি একবার মত দিয়েও তিনদিন পর নিশ্চিন্তপুরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন।

অগত্যা আমরা ঘন্টিকাকাকে ধরে বসলাম: সভাপতি হতেই হবে, জনসাধারণের সমবেত বিশেষ অনুরোধ

৩০শে বৈশাখ গোরক্ষা সমিতির গৃহে সভা আহ্বান করা হলো। ঘন্টিকাকার ছেঁড়া চটির ব্যবসা ছিল। সেটা ফেল পড়াতে নাস্যর ব্যবসা ধরলেন। আবার সেটাও ফেল পড়াতে পথে পথে সংকীর্তন করে বেড়ান। সংসারে তার বৈরাগ্য। অবশ্য সংসারে যখন কেউ নেই তখন তার ওপর আর রাগারাগি করেও কোন লাভ নেই।

ঘন্টিকাকা এক সভায় বলেছিলেন: রামপ্রসাদ সেন মশাই একটা আস্ত চোর—নইলে বলে: আমায় দে মা তবিলদারী? তবিলদারী না দিলে তো আর তবিলমারা যায় না—। এরা তো চোর নয় ডাকাত—বলে কয়ে সর্বস্বান্ত করে। ফলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘন্টিকাকার রসকলি কাটা খাড়া নাক এক কিলে বোঁচা করে দিয়েছিল। কাজেই আমরা ঘন্টিকাকাকে এনে সভায় বসিয়ে দিলাম। বললাম: ঘন্টিকাকা, একটু বাঁচিয়ে-টাঁচিয়ে বলো—অনেক দল আছে। যেমন তেমন বললে কিন্তু একেবারে হাসপাতাল!

: ওরে বাবা, তা সভাপতির গলার মালা কই? জিজ্ঞেস করলে একজন।

বিরক্তিতে খিঁচিয়ে উঠলাম আমি: ওসব হবেখন বাড়ী যাবার পথে। মড়ার খাটে দেবার ফুলের তোড়া দেবখন একটা কিনে। তারপর ঘন্টিকাকাকে বললাম: দেখুন স্যার, আপনাকে আনতে নগদ তিনটি টাকা খরচ হয়েছে—মনে রাখবেন, সেইরকম বক্তৃতা দেওয়া চাই। নইলে দলের ছেলেরা আমাকে মেরে তক্তা করে দেবে!

: বেশ, তবে কি জানো—আমার ভারি পেট-ব্যথা করছে। আর এই পেট-ব্যথা থেকে আমার কলেরা, বসন্ত, ডিপথেরিয়া এমন কি পতন এবং মূর্ছা পর্যন্ত হতে পারে। আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ঘন্টিকাকার গলার আর্তনাদ ফুটে বেরুলো।

: কি বললেন ? মহিষাসুর বধ থিয়েটারে আমার মহিষাসুরের পার্ট বাঁধা। আমি এমন করে একটা আসুরিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম ঘন্টিকাকার দিকে যে, ঘন্টিকাকা একেবারে মা দুর্গার শোলার সিংহ ; নড়েনও না, চড়েনও না ! শুধু হাঁ করে থাকে। ঘন্টিকাকা হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন : কার মুখ দেখে আজ তাঁর রাত পুইয়েছে।

হঠাৎ চমক ভাঙলো প্রবল হাততালিতে। তিনি একেবারে সভাপতির চেয়ারে। এতক্ষণ হয়তো ভিরমি খেয়েছিলেন, তাই বুঝতে একটু দেরী হলো—সব ব্যাপারটা।

সঙ্গে সঙ্গে একজন গলায় রুমাল বেঁধে ওর মেজদার ছোট হয়ে যাওয়া একটা প্যান্ট আর ছাপা বুশ সার্ট পরে ঘোষণা করলে : আজকের সভায় আমাদের পূর্ব ঘোষিত সভাপতি অসুস্থ থাকায় আমরা চিংড়াপোতার বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ঘন্টেশ্বরবাবুকে সভাপতি হবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। বড় বড় চুলওয়ালা এক ছোকরা চট করে দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারটা সমর্থন করতে না করতেই চারিদিকে শব্দ উঠলো : দূর দূর, আমরা কিম্বদন্তীবাবুকে চাই—বলতে বলতে বিরুদ্ধ দল একেবারে প্রবল চীৎকার করে লোক তাড়াতে চেষ্টা করলে ! কিন্তু উদ্যোক্তাদের ভাই বোন—কাকীমা, পিসীমা প্রভৃতি লরি ভরে এত জমায়েৎ হয়েছিল যে, বিরুদ্ধ দল আশানুরূপ ফল দেখতে পারলে না।

উদ্যোক্তারা খুব কড়া লোক। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন : এবার আমাদের সভাপতি তাঁর মূল্যবান ভাষণ দান করবেন ; আপনারা দয়া করে শুনুন।

"মাননীয় ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রলোকগণ"—একটা হো-হো করে হাসির আওয়াজ এল। "আজ রবীন্দ্রনাথের পবিত্র জন্মদিনে"—দূর দূর এটা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের পিতা হ্যানিমানের জন্মোৎসব। কথাটা কানে যেতেই ঘন্টিকাকা এক মিনিট বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর আবার আরম্ভ করলেন : "তাই বলছিলাম

বিশ্বকবি সিন্ধুতেই বিন্দুর কথা বলেছেন। সেই বিন্দুই হলো মহর্ষি হানিম্যানের হোমিওপ্যাথির মূল কথা।" আবার শব্দ উঠলো—দূর, দূর এসব বাজে কথা শুনতে চাই না—আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা শুনতে চাই। অমনি ঘন্টিকাকা আরম্ভ করলেন: "আর আজ আমাদের বারবার এই কথাটি মনে পড়ছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে—যিনি মহর্ষি হানিম্যানের অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিলেন।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে কপালের ওপর একটা প্রবল আঘাত আর মাথা ভর্তি কিসের ধারা নেমে পড়ল।

চারিদিকে মহাকোলাহল, সভাপতি অজ্ঞান হয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কুম্ভকর্ণবাবু সুরু করলেন: বন্ধুগণ, আমি আজ চার বছর হলো হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করছি। আজকের সভায় মহর্ষির চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার দায়িত্ব আমারই ছিল। কিন্তু কোথা থেকে এক ঘণ্টাকর্ণবাবু এসে আমার সে আশায় ছাই দিলো। আমি আর থাকতে না পেরে ট্যাক্সি ভাড়া করে গোবরা থেকে এসেছি। এক সের খাঁটি গাওয়া ঘি অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। দেখুন তার দশা! বলার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় লোক ছুটে মঞ্চের দিকে আসতে লাগল। হাতে তাদের গেলাস বাটি।



সভাপতি বিভ্রাট

চেয়ারে এলিয়ে পড়া ঘন্টিকাকার গায়ে নেকড়া বুলিয়ে বুলিয়ে ঘি-টা নিংড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ জ্ঞান হতেই ঘন্টিকাকা ব্যাপারটা এক মিনিটে বুঝে নিলেন : বুঝলেন ঘিয়ের টিনের ঘা দিয়ে তাঁর বক্তৃতা থামিয়েছেন কুম্ভকর্ণবাবু। তারপর হঠাৎ দেখলেন চেয়ারের পায়ার কাছে টিনটা পড়ে আছে।



ওতে এখনও প্রায় পো-টাক ঘি আছে। আর যায় কোথায় ? একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলেন, তারপর নিজের হাতটা শুঁকে দেখলেন : বাঃ ! খাসা ঘি তো।

আর দেরী করা কোন রকমেই উচিত নয়। ঘন্টিকাকা আবার এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর সেই বাকী ঘিয়ের টিনটা হাতে তুলে নিয়ে দে লম্বা--তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল পাড়ার একপাল কুকুর— সামনে দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে।

সভার মধ্যে তখন মহাসোরগোল পড়ে গেছে। সবাই কিংবদন্তীবাবুকে ঘিরে ধরেছেন : বক্তৃতা শুনবো না—ঘিয়ের দোকানের ঠিকানা দিন।

: নচেৎ ? আমরা দেখাচ্ছি আপনার মজা--বলার সঙ্গে সঙ্গে দুড়-দাড় করে ইঁট পড়তে লাগলো এবং মন্ত্রবলে এক মিনিটের মধ্যে আসর খালি। কুম্ভকর্ণবাবু প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় একবার এদিক আর

একবার ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ নিজের বুক পকেটে হাত দিতেই তাঁর বুকটা একেবারে ছাঁৎ করে উঠলো।

সভার সেক্রেটারী এই গণ্ডগোলের সুযোগে তাঁর পকেট মেরেছে।

খানিকটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে কুম্ভকর্ণবাবু পূর্বাপর অবস্থাটা চিন্তা করতে চেষ্টা করলেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো : ট্যাক্সী ভাড়া—

কুম্ভকর্ণবাবু প্রাণপণে ছুটলেন : ও মশাই—পকেট মেরেছেন মারুন, কিন্তু আমার ট্যাক্সী ভাড়া ?

এবার কেষ্টা বললে : তারপর ?

: তারপর আর কি ? তারপর আমিই ওকে শেষকালে চ্যাংদোলা করে একটা ছ্যাকরা গাড়ীতে তুলে দিয়ে বললাম : জোর হাঁকাও। বাড়ী গেলে মাইজী ভাড়া দেবেন।

আলোর শিশু

মোড় ফিরলেই আমড়াতলা। তারপর আর একটু এগোলেই পঞ্চুমুদীর দোকান—আরো একটু এগোলে নেড়াদের এঁদোপুকুর। পাশ দিয়ে সোজা নাক বরাবর এগিয়ে যেতেই ভীষণ একটা চিৎকার কানে এসে ভাঙা কাঁসির মতো বাজবে। যেন শব্দভেদী বাণ আর কি! সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগোলেই পাবে নেত্য পিসির বাড়ী। পিসিকে প্রথম দর্শনেই দারোয়ান বলে মনে হবে। কিন্তু একটু পরেই বোঝা যাবে এটা নিতান্তই ভুল ধারণা, তিনি আদি অকৃত্রিম নেত্য পিসি।

আসবার সময় বিশে অর্থাৎ বিশ্বনাথ আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল ঠিকানাটা। তার বোঝানোর ঠেলায় আমি গোলকধাঁধার মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছালাম। কিন্তু পৌঁছালে কি হবে? বাড়ী কিছুতেই চিনে বের করতে পারছি না।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল—নারী কণ্ঠের—। মনে হলো কোথায় লড়াই বেধেছে—। বিপন্না মহিলাকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে গিয়ে শুনলাম : কান্না নয়, গান! পিসিমা স্তব পাঠ করছেন—

"কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে বয়— !" নির্ঘাত পিসিমা! পিসিমা ছাড়া এ কণ্ঠ আর কারুরই নয়। নির্ভুল সমাধান! আমি বারান্দায় গিয়ে বসতেই দেখি পিসিমা ছুটে এলেন—হাতে একটা লম্বা আখ—!

: মারবে নাকি, ওরে বাবা! দু পা পিছিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। হাতের আখটা নামিয়ে দাঁতে তামাক পাতার গুঁড়ো ঘষতে ঘষতে

তরমুজের বিচির মতো দাঁত বের করে বললে : পাগল নাকি তুই, ওই দেখছিস তো ? পেট-রোগা নাতি দুটো কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে ! তাদের ওই আখ দিয়ে বসিয়ে না দিলে আমার পুজোয় চালকলা, মায় ঠাকুর পর্যন্ত আমসত্তর মতো চেটে চেটে খেয়ে ফেলবে—।

: ওরে বাবা !—আমি বললাম : খেতে তো ভারি ভালোবাসে আপনার নাতিরা ?

: হ্যাঁ, তা একটু বাসে। তবে কি জানিস্ একটু বেশী রকমই। আর একদিন তো এক বোতল তারপিন তেলই খেয়ে ফেলেছিল। তারপর কি করি, ডাক ডাক্তার—ডাক কবরেজ। ওমা, নাতি দুটো তখন ঘরে ঢুকে চুরি করে তিলের নাড়ু খাচ্ছে। নবদ্বীপ কবরেজ তো ওদের চরণামৃত খেতে চাইলে। ওর বাবা তো ওদের বৃকোদর বলে ডাকে ! ওমা, তুই যে এতো পথ হেঁটে এসেছিস—তা তো আমার খেয়ালই নেই ! আয়—আয়, একটু জল খাবি আয়। পিসিমা আমার হাত ধরলেন।

: আসি, বলেই পিছন ফিরতে দেখি আমি নগদ দশ পয়সা খরচ করে যে কাঁঠালটা বয়ে এনেছিলাম পিসিমার জন্য, সেই কাঁঠালটা প্রায় অর্ধেক সাবাড়—আর যত আঠা আমার সার্টের পেছনে ওই দুটি শ্রীমান কখন মুছে দিয়েছে, জানি না ! হয়তো যখন খুব অবাক হয়েছিলাম তখনই !

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—পিসিমা সর্বনাশ হয়েছে ! আমার নতুন সার্ট—আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম।

: তা, তোরও বাড়াবাড়ি দীনে ! আঠা বই তো নয়, ও সর্ষের তেল দিলেই উঠে যাবে। আর অমন করে চেঁচিয়ে কি মানুষকে ভড়কে দিতে হয় ? ওরে গজা আর ভজা, তোদের দীনু মামাকে প্রণাম কর্। ও দীনু, তুই ওদের একটু ক্ষমা কর্। আহা মা-মরা ছেলে দুটো—! নে নে, একটু কোলে নে। গোলগাল দুটো কোলবালিশের

মতো ছেলে দু'হাতে আঠা আর ভুঁতি মেখে আমার দিকে ছুটে আসছে—কি করি! কিন্তু কিছু করবার আগেই দু'জনে আমার কোলে চেপে বসে সর্বাঙ্গে কাঁঠাল মাখিয়ে দিলে। তারপর ধীরে ধীরে আমার বুক পকেট থেকে মেজমামার বিয়ের উপহারটা নিয়ে চুষতে লাগলো।

সকাল থেকেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিকে থৈ—থৈ জল। বাইরে বেরুবার উপায় নেই। গজা আর ভজা ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে—কোথায় কি খেতে পাবে। খাটিয়ার ওপরে শুয়ে শুয়ে আমি দেখতে লাগলাম ওদের কার্যকলাপ। শেষে বলেই ফেললাম: ঘ্যাঁক্-ঘোঁক্ করে কতো ব্যাঙ্ তো ডাকছে—গোটা কতক ধরে খা না—!

: দু-ত্তোর! তোর যত কথা! পিসি বললেন।

: তুমি জানো না পিসি, তোমার ওই গজা-ভজা একদিন পেট ফেটেই মারা যাবে।

: তুই বল্‌লি কি দীনে! পিসি আর্তনাদ করে উঠলো। ওরাই আমার শিবরাত্রির সল্‌তে। তোর এমন কথা মুখে আনতে বাধলো না?

: শিবরাত্রির সল্‌তে না, শিবরাত্রির কাছি বলো! বাপ্‌রে বাপ্! এমন খাদক আর কখনও দেখিনি—যাকে বলে 'বিশ্ব-খাদক'।

: মুখ সামলে কথা বলবি দীনে। এই ছেলে দুটো তোর চোখের বালি হয়েছে। কেন, তুই কি খেতে পরতে দিস ওদের, না মানুষ করবার দায়িত্ব নিয়েছিস?

: ওদের দায়িত্ব কে নেবে বলো। ওদের দায়িত্ব নিয়েছে স্বয়ং ভগবান—মানে পিসিমা—

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা টিন পড়বার বিকট আওয়াজ হলো। পিসি ছুটে গিয়েই দ্রুত ফিরে এলেন।

: ব্যাপার কি? আমি বিছানা থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে অবাক না হয়ে উপায় নেই।

পিসির দালদার টিনের মধ্যে বসে ভজা, আর গজা ভেতরে ঢুকতে না পেরে ভজার গা চেটে চেটে খাচ্ছে। মাত্র পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে দুটো রাক্ষস না কি?

: ওদের হাসপাতালে পাঠাও পিসি। এতো দালদা খেয়েছে, ওদের নির্ঘাত কলেরা হবে!

পিসি বললেন: ওরে দীনে, আমাকে বাঁচা, তুই সঙ্গে করে নিয়ে



যা। মা-মরা ছেলে দুটোকে তো মারতে পারি না। তুই একটু হাসপাতালে নিয়ে যা বাবা।

পিসির চিৎকারে কুলো, ডালা, ধামা মাথায় দিয়ে পাড়ার মেয়েরা ছুটে এলো বৃষ্টির মধ্যেই।

: কি কাছিমের প্রাণ বাছা তোমার। ওই যে মানুষটো কেষ্টর জীব, এতো কাঁদছে—তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না?

: আহা—হা! অমন কুমড়োর মতো ছেলে দুটো একেবারে পুঁই ডাঁটার মতো নেতিয়ে পড়েছে গো—

: না হয় একটু খেতেই ভালোবাসে, তাই বলে রোগে চিকিৎসা করা হবে না?

: বাড়ীতে পুরুষ মানুষ থাকতে ছেলে দুটো বেঘোরে মরবে?

এবার জনমত ছাপিয়ে পিসিমার গলা মাথুরের বিলাপের মতো প্রতিধ্বনিত হলো—কি হবে গো—ও—

: না না, ভয় নেই, আমি এখনি যাচ্ছি—অগত্যা ব্যস্ত হতেই হলো। ছেলে দুটো সত্যিই নেতিয়েছিল। কিন্তু কি ওজন! সাধ্যি কি আমি একা ওদের তুলি। কিন্তু সে কথা তো বলবার উপায় নেই—কাজেই আমাকে নিজেই চেষ্টা করে তুলতে হলো যেন একমণি এক একটা কয়লার বস্তা তুলছি!

হাসপাতালে গিয়ে হঠাৎ আমার চেনা এক ডাক্তার বেরিয়ে গেল। তাকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

: একি, তুই এখানে? ছুটিতে বুঝি বেড়াতে এসেছিস?

: হ্যাঁ ভাই। কিন্তু বড় বিপদে পড়েছি, উদ্ধার কর!

: এ দুটো কিরে? এ গিরিগোবর্ধন কেন টেনে এনেছিস? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে।

: আর বলিস কেন? আমার পিসিমার নাতি। এরা আধ টিন দালদা খেয়ে ফেলেছে, এখন—

: মারা গেছে নাকি? বলে, বেশ করে পরীক্ষা করে বললে: ঘুমোচ্ছে, ওদের বাড়ী নিয়ে যা—এরা কি মরবার পাত্র?

ডাক্তারের মর্মান্তিক সংবাদে অত্যন্ত আঘাত পেলাম: ছিঃ ভাই, তুই ভারি নিষ্ঠুর। এই মাতৃহারা শিশুদের জন্য তোর বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই? একবার দেখ ভাই! ওদের যদি আমি বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে নিই তবে আমাকে পাড়ার মহিলা-মহল পিটিয়ে তক্তা করে দেবে!

: যা, রেখে যা। তোর কোন চিন্তা নেই। অভয় পেয়ে রাত বারোটায় বাড়ী ফিরলাম।

একটু বেলা করেই চা খাচ্ছি। পিসি মাঝে মাঝে হা-হুতাশ করছেন, আর দেড়-সেরী মগে করে চা আর গোটা কতক নারকোলের

নাড়ু খাচ্ছেন, এমন সময় ভাঙা হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে কথা বলবার মতো করে কে যেন চিৎকার করে উঠলো ! পিসি বিষম খেয়ে খক-খক করতে লাগলো—আমি ছুটতে গিয়ে পিসির বেড়ালটাকে ফুটবলের মতো গড়িয়ে দিলাম।

বাইরে গিয়ে দেখি গজা আর ভজা হাত ধরাধরি করে বাড়ী ঢুকছে আর বজ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হাসপাতালের দারোয়ান !

: কি হয়েছে দারোয়ান ?—

: কি হয়েছে ? দারোয়ান খিঁচিয়ে উঠলো—আরে বাবু, ছেলে ছুটো যেন ডাকু। ডাক্তারবাবু বললেন—কাল রাতে ওদের কিছুই হয়নি, ওরা ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভেঙে জেগেই ওরা ঘরের ওষুধ খেয়েছে ; বোরিক তুলো খেয়েছে চার প্যাকেট—আর ব্যাণ্ডেজের কাপড় খেয়েছে অনেকটা। তারপর জোয়ানের আরক খেয়েছে এক বোতল। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ঘর-সুদ্ধ রুগীদের খাবার দেবার আগেই ও ছুটি আলোর শিশুকে বাড়ী দিয়ে এসে আমাদের বাঁচা।

আমি এ উপসংহারের জন্য সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না। কাজেই বললাম—আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

বাঁদরের সঙ্গে বাঁদরামি

: বাঁদর আমার বেশ ভালো লাগে !—হঠাৎ বলেই ফেললাম কথাটা।

একটা কৌটো খুলে একটিপ পরিমল নস্যি বের করে নাকের দুটো নলের মতো ফুটোর মধ্যে টিপে টিপে ঢুকিয়ে দিয়ে বাকীটুকু পুট করে আমার চোখের মধ্যে ঝেড়ে দিয়ে—বাঁদরের মতো ভেংচি কেটে বললে কেষ্টামামা : তা আর লাগবে না ? বন্ধু যে, একেবারে প্রাণের বন্ধু !

আমি তখন চেয়ারে বসে চিন্তা করে করে একটা অঙ্ক কষছিলাম। একটা তেল-মাখা বাঁশের ওপর বাঁদর ওঠবার অঙ্ক। আর মাঝে মাঝে বাঁদর সম্পর্কে আলাপ করছিলাম কেষ্টামামার সঙ্গে। কিন্তু এই অপরাধে পটলপিসিকে আনবার জন্য আমাকে তার সাথে ষ্টেশনে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করবার মানে কি ? অঙ্ক-স্যার নকুলবাবু যখন ছড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে আমাকে মারবে তখন কি কেষ্টামামা রক্ষা করবে, না পটলপিসি সামনে এসে দাঁড়াবে ?



: না, আমি যাব না।

: অঙ্ক হলো না বলে তোকে আমরা ফাঁসি দেব, না ? চল শীগগির—গাড়ী হয়তো এতক্ষণে এসেই পড়লো। পটলপিসি আবার যেমন লোক—কেঁদে কেটে একশা করবে আমাদের কাউকে না দেখলে।—আমার হাতটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে কেষ্টামামা যাত্রা-দলের কংসের মতো বেরিয়ে গেল।

কতক পথ শূন্যে—কতক পথ পদব্রজে—কতক পথ কলার খোসার ওপর পিছলে পড়তে পড়তে কেষ্টামামার হস্তগত হয়ে আমি হাওড়া ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম। কেষ্টামামার সঙ্গে টাগ অব ওয়ার করতে করতে যখন প্লাটফরমে এসে পৌঁছালাম তখন যাত্রীদের ওঠা-নামা—হুড়োহুড়ি সুরু হয়ে গেছে, কিন্তু পটলপিসিমা কই ?

আমি বললাম : বোধ হয় ভাজা হয়ে গেছে—খুঁজে দেখ। আমার কানটার ওপর একটা খামচি কেটে কেষ্টামামা বললে : তুই একটা আস্ত—

কথাটা শেষ হতে না হতেই কেষ্টামামা একটা প্রচণ্ড লাঠির খোঁচা খেয়ে উঁহু করে উঠে পেছন ফিরতেই পটলপিসিমা বললেন : এখানেও মারামারি ! বলি আর শোধরাবে কবে ?—বাঁদের আর কি গাছ-পাথর আছে ? বুড়ো বুড়ো ছেলে দুটো মারামারি করে মরছে—জ্বালা আর কি !

আমরা দু'জনেই পিসিমার দিকে তাকালাম। মাথা ন্যাড়া, তাতে একটা প্রকাণ্ড টিকি পতাকার মতো উড়ছে—নাকে ড্রইং করা, গায়ে নামাবলী, বাঁ হাতে একটা ঘটি আর লাঠি। আর ডান হাতটা সন্দেহ-জনকভাবে নামাবলীর তলায় লুকোনো।

: ওর মধ্যে কি পিসি ?—

: চুপ কর, ও কথা পরে হবে। শীগগির বেরিয়ে চল, কেউ আবার শুনবে।—

রিকশার ওপর চেপে পাশে কেষ্টামামাকে বসতে সাদর আহ্বান জানিয়ে পিসি আমাকে বললেন : বোস বিনে, ওই পায়ের কাছে।

: তোমার কোলের পোঁটলাটা কেন পায়ের কাছে রাখো না—আমি তোমার কোলে বসবো।—আমি বললাম।

: ওর মধ্যে কথা আছে। মেলা বকিস্ না, এখন বসে পড়।—পিসিমা খিঁচিয়ে উঠলেন : চল্ রিকশে, চল্ তাড়াতাড়ি।

: ওটার মধ্যে কি আছে—নড়ছে কেন ?—কেষ্টামামা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভেতর থেকে কেমন যেন ঝটাপটি আর কিচ্-কিচ্ শব্দ আসতেই আমি বললাম : পাখী বুঝি—পটলপিসিমা ?

: পাখী !—পাখীর নিকুচি করেছে ! আমায় আঁচড়ে কামড়ে শেষ করলো। চল না বাড়ী।

রিকশাও চলতে লাগলো, পটলপিসিমার কোলের গোলমালও বাড়তে লাগলো। নখ দিয়ে ক্রমাগত জামা আঁচড়াতে লাগলো আর মাঝে মাঝে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে হাঁচতে লাগলো। তার সঙ্গে চললো পিসিমার চিৎকার : চল বাড়ী—তোকে মজা দেখাব। আবার পিঠ চুলকোনো হচ্ছে।



কিন্তু ভগবান বুঝেছিলেন উল্টো। বাড়ীতে নামতেই একেবারে নড়ন্ত বোঁচকা সশব্দে পিসিমাকে কিচির-মিচির করে জান্তব স্বরে আপত্তি জানালো তার মাতৃভাষায়।

: ওমা, ও কি ! ও পটল ঠাকুরঝি, একটা গোদা বাঁদর যে গো!—মা একেবারে সাইরেনের মতো চিৎকার করে বললেন।

: আর বলো না বৌদি ! যত আপদ কি আমার কপালে। খেলার ছলে পুষেছিলাম, এখন ওই আমাকে নিয়ে প্রায় খেলা দেখাবার মনস্থ করেছে কোমরে দড়ি বেঁধে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরটা হাতে বাঁধা দড়ি এক টানে ছাড়িয়ে দাওয়ায় বসে তরকারী কাটতে নিযুক্ত ক্ষেন্তপিসিমাকে কুলগাছে ঝাঁকি

দেওয়ার মতো করে একেবারে ঝকমকিয়ে নাড়িয়ে দিয়ে, বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

'গেল—গেল' শব্দের সঙ্গে ক্ষেন্তপিসির কান্না সানাই-এর পোঁর মতো একটানা ককিয়ে চললো। চারিদিকে হুলুস্থূল।

: তোমার বাঁদর বিদেয় করো বোন! কখন কাকে কামড়ে শেষ করবে।—মা বিরক্ত হয়ে বললেন।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা পটলপিসিও ভাবেন নি। কাজেই তিনি একটু ভড়কে গিয়ে ঘন ঘন চোখ পিট্-পিট্ করতে লাগলেন।

সেদিন একটু ঠাণ্ডাই পড়েছিল। দাওয়ায় দড়ি দিয়ে বাঁদরটা বাঁধা আছে আর রোদে পিঠ দিয়ে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দাদু দাড়ি কামাচ্ছিলেন। বাদরটা নিবিষ্ট হয়ে তাঁর সব কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। মাঝে মাঝে দাদুর উদ্দেশে সে ভেংচিও কাটছিল অভ্যাসদোষে।

ঘরে কম আলো। দিদিমা ঘরে ঢুকে দেখেন তখনও দাদু দাড়ি কামাচ্ছেন।

: দাড়ি কামানো কি আজ আর শেষ হবে না?

দিদিমা চোখে কম দেখেন, কানেও কম শোনেন; কাজেই বার বার অ্যা-অ্যা করতে লাগলেন।

: হুম্!—দাদু বললেন।

: হুম্ বৈ কি! বড় বাহাদুরী হচ্ছে। ভর সন্ধ্যেবেলা কি চোখে ভালো দেখা যায়! তাতে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে।

: ফ্যাচ্-চো—ও।

: তোমার তো বড্ড সর্দি হয়েছে, রাখ এখন আয়না।

: খ্যাক্—কো—কিচ্!

আর বসে বসে ঝিমোতে হবে না।—

বলে, দিদিমা কম্বল টান দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো

সেই প্রকাণ্ড মোটা বাঁদরটা—বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে। 'ওরে বাপরে' বলে দিদিমা এক দৌড়।

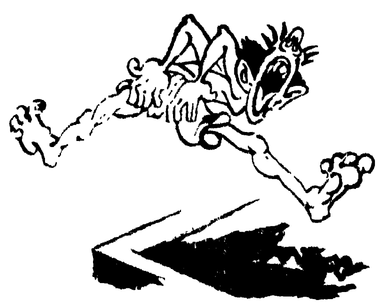
আসলে দাদু ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন অনেক আগেই আর সেই সুযোগে বাঁদরটা বসে বসে দাড়ি কামাতে চেষ্টা করছে।

দিদিমা হাঁই-মাঁই করে ছুটে বেরুলেন। পেছনে পেছনে বাঁদরটাও বেরুলো আর তার হাতে চক্‌চকে ধারালো ক্ষুর। গোঁফ ফুলিয়ে, ল্যাজ নাড়িয়ে, ক্ষুর বাগিয়ে বাঁদর বললে : চিন্‌-কিলিচ-খাঁ!

খেন্তুপিসি উঠোনে বসে ঘুঁটে দেবার জন্যে বড় বড় গোবরের নাড়ু পাকাচ্ছিলেন। বাঁদর সেদিকে এগোতেই তিনি 'বাবা গো—গেলাম'—শব্দে দৌড় দিতে গিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলেন। আর গোবরের তালটা তাঁর মুখে লেপটে বেমালুম ছাঁচ হয়ে গেল।

বাঁদর বললে : ইলিচ—মিলিচ—কিলিচ!—ভাবটা যেন এই ক্ষুরে কার কান কাটবো?

বলতে বলতে আমাদের দিকে তার চোখ পড়লো। আমি আর কেষ্টামামা তখন পুবের বারান্দায় বসে বেলের আঠা দিয়ে ঘুড়ি আঁটছিলাম।



'ইল্লিক-বিল্লিক কচি মল্লিক' বলে বাঁদরটা আমাদের দিকে তেড়ে এলো।

'ওরে বাবারে' বলে কেষ্টামামা সদরের দিকে ছুটলেন। আমি এক লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সোজা একেবারে চৌবাচ্চার ভেতরে। চৌবাচ্চার ভেতরে ভরা জল। ডুবে দেখতে লাগলাম বাঁদরটা কি করে। ভরসা আছে ওরা জলকে ভয় পায়, সহজে এদিকে আসবে না।

দিদিমা গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিলেন। পটলপিসি খাটের তলায় ঢুকে সমানে বাড়ী ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন: ওগো, কে কোথায় আছ গো—বাঁদরটা খেপেছে গো—ক্ষুর দিয়ে সকলকে কেটে ফেললে গো।

শুধু মা'রই যা একটু সাহস। দাদুর একটা ভাঙা ছাতা নিয়ে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেবল বললেন: হুস্—হুস্—হুস্—পালা বলছি। হুস্—হুস্!

বাঁদর মাকে বেশ কয়েকবার ভেংচি দিয়ে বললে: ক্লাচ্—ক্লু—খ্যা—খ্যা—খেঁক্‌খোস্।

মা বললেন: খোঁক্‌খোস্? একবার এদিকে আয় না, দেখিয়ে দিই তুই কত বড় খোঁক্‌খোস্!

পটলপিসি সমানে চেঁচিয়ে বলছেন: ওগো খেলে গো—বৃন্দাবনের বাঁদর সকলকে ক্ষুর দিয়ে কেটে ফেললে গো—ওগো কে কোথায় আছো গো!

: চিলিক—চালাক—ঘচাঘচ—খু খুঃ।—বলে বাঁদর বার কয়েক উঠোনের মাঝখানে নেচে নিলে। তারপর—

ল্যাজে বোধ হয় তার এঁটুলি কামড়াচ্ছিল। 'খ্যাঁক খ্যাঁ—অাঁযু' —বলে অন্যমনস্কভাবে হাতের ক্ষুর দিয়েই বাঁদর মনের ভুলে ল্যাজ চুলকোতে গেল।—'গ্যাঁক্—প্লাস' বলে ল্যাজে ক্ষুর লাগাতেই ব্যস্—আর প্লাস নয়, একেবারে মাইনাস্। ঘচাং করে গোড়া ঘেঁষে ল্যাজটা মাটিতে নেমে গেল। আর ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ধারা।

: জাম্বু—নাম্বু—ঘাম্বু—উজিং—খুঁ—খুঁ—পাঁচু ঘোষ বলে বাঁদর একটা লম্বা লাফ দিয়ে হাত সাতেক আকাশে উঠলো—তারপর পতন ও মূর্ছা। একেবারে অজ্ঞান।

আমি আর কেষ্টমামাই বাঁদরটাকে পশু চিকিৎসালয়ে দিয়ে এলাম। ল্যাজের ঘা শুকিয়ে গেলে ওখান থেকে সোজা তাকে আলিপুরের চিঁড়িয়াখানায় চালান করা হবে—তার বাড়ীতে নয়।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে কেষ্টামামা বললে : আহা—বাঁদরটার অমন ল্যাজটা কাটা গেল। ভারী দুঃখু হচ্ছে।

আমি বললাম : ওটা তোমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছে, তুমি পরে নিও—তোমাকে চমৎকার মানাবে।

: কী বললি ? বলে, কেষ্টামামা আমায় তাড়া করতেই আমি সামনের চলতি ট্রামটায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম। কেষ্টামামা সেটা ধরতে পারলো না।

বন্ধুর গাড়ীতে

কালো কুটকুটে ঘামাচিভরা পিঠে পট করে একটা চাটি হাঁকিয়ে পটলমামা বললে : জানিস্ কেষ্টা, এই মশাগুলোর জ্বালাতেই আমার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে না। তুই দু'পয়সার ছোলা-টোলা আনানা, খাই। তবু একটু মুখ বদলানো।

—পয়সা দাও—কেষ্টা বললে।

বাদুড়ের মতো দাঁত খিঁচিয়ে পটলমামা বললে : তোর সঙ্গে দু-একটা পয়সাও রাখতে পারিস না—একেবারে ক্যাবলা তুই। তবে একটু আচার নিয়ে আয়।—ঠোটটা চুকচুক করে চুষে পটলমামা বললে।

—আচার পাব কোথায়? আচারের হাড়ি তো ঠাকুমা মাথায় দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

—তবে মোটর চড়া—চাল্‌তের মতো ভুঁড়িটা ভাঁজে ভাঁজে দুলিয়ে পটলমামা বললে।

—বরং এ প্রস্তাব মন্দ নয়, কেষ্টা বললে : আমার বন্ধুর একটা গাড়ী আছে, সেটায় চড়ে একবার বেশ বেড়াতে-টেড়াতে যাওয়া যাবে।

বঙ্কার কাছে মোটরের কথাটা পাড়তেই বঙ্কা যেন আনন্দে ব্লাডারের মতো ফুলে উঠে আবার হঠাৎ চুপসে গেল : আমাদের মোটরটা ভাই অনেকদিন গ্যারেজে পড়ে আছে। দেখি, বলি গিয়ে—যদি বাবা মত দেন আর রাম সিং ড্রাইভার যেতে রাজি হয়।

—তুই একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলিস্ ভাই। নইলে আমার পটলমামা

আমার কানকে টানতে টানতে কুলো বানিয়ে সেই কুলোর বাতাস আমার গায়েই দেবে।

—জিজ্ঞেস করে না দেখে তো আর কিছু বলা যায় না। এসব গাড়ী-ঘোড়ার জটিল ব্যাপার।

—বেশ তাই হবে। কেষ্টা বললে গম্ভীরভাবে।

বেলা চারটের সময় খবর এলো: বঙ্কার গাড়ী রেডি, তারা যেন এক্ষুণি এসে পড়ে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টা, তার পটলমামা, কেষ্টার দুই ছোট ভাই, পটলমামার বন্ধু, সবাইকে নিয়ে গিয়ে দেখলে বঙ্কার ভাই-বোনে গাড়ী ভর্তি—একেবারে ঢাকা মেলের অবস্থা।

—একটু কষ্ট করে চেপে-টেপে বোস ভাই: বঙ্কা বিনয় করে বললো গাড়ীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে।

—একেবারে মুড়ির টিনের মতো করে ভরেছিস দেখছি—হাঁড়ির মতো মুখ করে বললে পটলমামা।

গাড়ীতে হ্যাণ্ডেল মারতেই পুঁইএর মাচার মতো গাড়ীতে ফট ফট করে বোমা ফাটবার মতো শব্দ হলো। গাড়ীর ভেতরে যারা ছিল একেবারে চুপ। কিছুক্ষণ পরে ভন্ ভন্ শব্দ করে রাম সিং-এর চারিদিকে ক্ষুদে বোল্‌তারা চক্রব্যূহ রচনা করলো। অবশ্য লক্ষ্যটা ছিল বঙ্কার দিকেই, কিন্তু তাকে না পেয়ে পুট পুট করে কানে-নাকে হুল ফুটিয়ে দিলে। অনেকদিন অচল গাড়ীতে ওরা চাক বেঁধেছিল।

—ওরে বাপরে—মারে—করে রাম সিং ছুট দিলো।

—আহত—আহত!—পটলমামা গাড়ীর মধ্যে থেকে চিৎকার করতে লাগলো।

—ও আবার ফিরে আসবে, তুমি চেঁচিও না।

ঠিক, হলোও তাই। ক্ষুদে বোলতার কামড়, কাজেই কতক্ষণ পরেই ফিরে এলো রাম সিং। গাড়ী এবার চলতে লাগলো। নানা রকম শব্দ করে—কখনও বা দুলে দুলে, কখনও ফট-ফটিয়ে চলতে

লাগলো। গাড়ীর ভেতর যারা ছিল গাড়ীর দুলুনিতে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে এসে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে পটলমামা ঘটোৎকচের মতো কুরুকূল চেপে পড়ছে—এ যেন চালুনিতে কাঁকর চালা হচ্ছে।

গাড়ী সহরের রাস্তা ছেড়ে গ্রামের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরেছে। গাড়ীর শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সঙ্গে ছুটেছে নেড়ী কুত্তো, একদম দালদায় ভাজা—রোঁয়া ওঠা। আর ছুটেছে একপাল ছেলে।

কেষ্টা বললে: পটলমামা, বিষ্টি এলো যে—

—তা আমি কি করবো? আকাশে তো ছাতা ধরে বসতে পারি না!

—গায়ে বিষ্টি পড়ে যে—বঙ্কার বোন টুনি বললে।

—ছেলেরা হুড ছিঁড়ে দিয়েছে পটলমামা—কেষ্টা বললে।

—চুপ কর। আমিই প্রায় পটল তোলবার উপক্রম হয়েছি, এমনও বেড়াতে আসে লোকে!

হঠাৎ কড়্ কড়্ করে বাজ ডাকলো। আর নেড়ী কুকুরটা লেজটা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে জঙ্গলে ছুট দিলো।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। ছেলের দলও ঘরের দিকে ছুটেছে। গাড়ী হঠাৎ একটা বাঁক ফিরতে গিয়ে ফট্ ফট্ করে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। রাম সিং ঘোষণা করলে: দাদাবাবু, আর তেল নেই—গাড়ী চলবে না।

—এখন উপায়?—বঙ্কা বললে।

—আমি তো আর তেল বানাতে পারবো না। তোমরা তেল আনো।

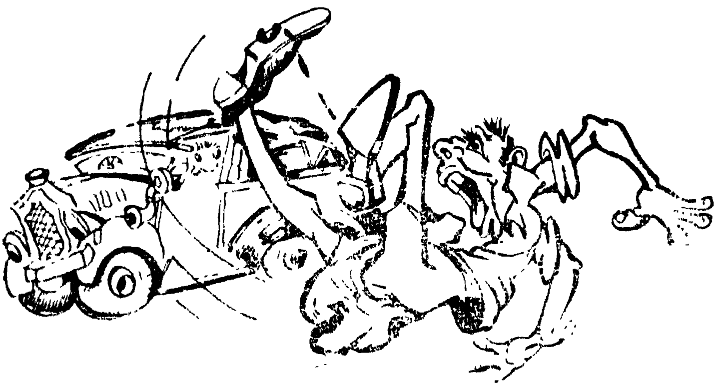
—এই এতো রাত, তার ওপর অন্ধকার! কোথায় তেলের দোকান কি করে জানবো।—পটলমামা বললে।

—তবে সবাই ঠেলো। আমি জানি পাম্প কোথায় আছে।

বেশীর ভাগ ছেলেপুলেই তো ঘুমিয়ে গেছে, কাজেই যারা জেগে

ছিল তারা নেমে ঠেলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তাতে কি আর অত বড় গাড়ী নড়ে ?

পটলমামা, বঙ্কা আর কেষ্টা মোটর ঠেলতে লাগলো। হঠাৎ ধাঁই করে একতাল গোবরে পা পড়ে পটলমামা একেবারে ধরাশায়ী। বঙ্কা আর



কেষ্টা টেনে তুলতেই পটলমামা একেবারে গোবর-গণেশ হয়ে বসেছেন। পচা গোবরের গন্ধে একেবারে কস্তুরী মৃগীর মতো ছটফট করছেন।

জঙ্গলের পটে শেয়ালেরা একেবারে একসঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠলো। জোনাকীরা মিটমিট করে জ্বলছে ঝোপে-ঝাড়ে। পটলমামা ! কলকাতার এত কাছে বাঘ—? এ কি আফ্রিকা ?

—দেখ কেষ্টা—জোরে ঠেল্। কোন কথা বলিস না! বাঘ নেই—তবে আসতে কতক্ষণ ? আর আসবার আগে কি তোকে জিজ্ঞেস করে আসবে নাকি ?

—উঃ ! সমস্ত শরীরে একেবারে ব্যথা হয়ে গেল।

—আর পারব না ঠেলতে—বঙ্কা বললে।

—পারবি নে তো এমন গাড়ী এনেছিস কেন ?

পটলমামা কটকটিয়ে ছোলা ভাজা খাবার মতো করে বললে।

—দাদাবাবু, সহর এখনও অনেক দূরে। তুমি এক কাজ কর একটা লণ্ঠন আমার সঙ্গেই আছে, জ্বালাও তো।

—কেন রে ?—কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পটলমামা বললে।

—গাড়ীর লাইটটা খারাপ হয়ে গেছে। রাম সিং বললে।

—তোর পটলমামাটাই অপয়া কেষ্টা—বঙ্কা খেদ প্রকাশ করলে। একেবারে স্রেফ অযাত্রা—।

—আর পটর পটর না করে লণ্ঠনটা জ্বালা, নইলে এক্ষুণি খানায় পড়তে হবে—পটলমামা বললে।

লণ্ঠন জ্বালানো হলো। পটলমামা বললে : তুই লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চল কেষ্টা। আমি গাড়ী ঠেলি।

—না পটলমামা, তুমি লণ্ঠন নাও ; আমিই বরং গাড়ী ঠেলবো।

—কতদূর যেতে হবে এইভাবে লণ্ঠন নিয়ে ?—হতাশভাবে পটলমামা জিজ্ঞেস করলে।

—তা কোন্নগর পর্যন্ত যাবে বৈকি !—রাম সিং বললে।

—একেবারে কোন্নগর ! তুমি বল কি ?

—ঠিকই বলি—কপালে থাকলে আরো বলবো ! আর পটলমামা, ভবিষ্যতে তুমি যেন কারু সঙ্গে আর বেড়াতে যেয়ো না। তাহলে এমনি করে সারা রাতই লণ্ঠন নিয়ে হাঁটতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখের কাছের মশার পাল তাড়িয়ে পটলমামা বললে : চুপ কর কেষ্টা, কথা বললে মুখে মশা ঢুকে যাবে।—পটলমামার গলা দিয়ে একরাশ কান্না ঠেলে এলো যেন।

মুস্কিল আসান

মটর-ভাজা খেতে খুব ভালোবাসে ভুতো। আর সত্যি কথা বলতে কি সবারই ভীষণ ভালো লাগে কুর-কুর করে মটর-ভাজা খেতে। কিন্তু মা তাকে কিছুতেই খেতে দেবেন না। ভারি পেট রোগা কিনা, তাই। কিন্তু তাতে কি হবে, ছোট ভাই পটলাই বা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে কেন ? তার বুঝি রাগ হয় না ? ধাঁ করে একটা চড় কষিয়ে দিলো ভুতো পটলার গালে। ভঁ্যা করে একটা বিকট চিৎকার করে উঠলো সে। মুখের ভেতরের আলজিভটা পর্যন্ত লক লক করে নড়ছে, আর লালায় ভেজা মটর-ভাজাগুলো মাছের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে— মুখের ভেতরই।

: চুপ কর। কাকে ঠোক্কর দেবে মুখে—

: ভ্যাঁ !—তুমি মারলে কেন ?—পটলা বললে।

: কেন তুই খালি খালি আমার সামনে মটর-ভাজা খাস। আমার বুঝি কষ্ট হয় না ?

: আর খাব না।—পটলার স্বীকারোক্তি বেরিয়ে এলো।

: কিরে, ভুতো বুঝি মটর-ভাজা খাচ্ছে ? মা বেরিয়ে এলেন !

: না মা, খাইনি !

: সত্যি বলছিস তো ! পেটের অসুখে ভুগে ভুগে তোর ভারি নোলা বেড়েছে আর একদিনও লুকিয়ে কাটলেট খেয়েছিস—এদিকে তো পেটে কিছুই সয় না। সাধ তো পুরো আছে। এদিকে তো তোলা মেপে পোরের ভাত খাচ্ছিস। ধন্যি নোলা তোর বাপু—

: জানো মা, দাদা আমার কাছে মটর-ভাজা—

: কখন চাইলাম রে—ভূতো ছুটো চোখ লাট্টুর মতো ঘোরাতে লাগলো।

: চাসনি ? ওই যে, আমি যখন মাছুরে বসেছিলাম আর চড়াই পাখীটা জানলায় উড়ে এলো তখন—?

: এই পটলা, ফের ! মিথ্যে কথা বলবি না বলছি। নাকের ওপরে ঘুসি দিয়ে তোকে লাল বাহাছুর বানিয়ে দেব।

: মা, দেখ কি বলছে ! আবার পটলা চীৎকার করে উঠলো।

আলমারী থেকে তিলের নাড়ু বের করতে করতে মা বললেন, : থাম্ বাপু থাম্। না দেখলেও দাদার জন্যে অস্থির, কাছে এলেও মারামারি, ঝগড়া—। এবার চুপ করতো। এই পটলা, সন্ধ্যে হলো—হাত পা ধুয়ে পড়তে বোস। যা—ভূতো, আজ একটু অঙ্ক-টঙ্ক কর্ দেখি। সবই তো গাঁদালের ঝোলের সঙ্গে খেয়ে রেখেছিস।

মা'র সব কাজ মিটিয়ে শুতে একটু দেরীই হয়। ও কৌটোর মুখটা বাঁকা ; এটা ইছুরে খাবে ; এ সব পরখ করে দেখতে দেখতেই তাঁর রাত হয়ে যায়, আবার শুয়েই চট্ করে ঘুমোন না। ভারী মুস্কিল।

কুট—কুট—কুট—। অন্ধকারে একটা ক্ষীণ এবং মৃছু আওয়াজ এলো। কট—কটর—র।

: কে-রে ?—মা সাড়া দিলেন। অন্ধকার স্তব্ধ হয়ে রইলো শুধু।

: কট-কট-কটর--

: কে—নিশ্চয় আলমারীতে ইছুর ঢুকেছে। আর পারিনে বাবা। এতো বড় বড় ইছুর—যেন বেড়ালের বাচ্চা ! আলমারীর সব জাল-টাল কেটে ফেললো। ও ভূতো—একটু আলোটা জ্বালাতো বাবা।

কোন সাড়া এলো না।

: ও পটলা, বাবা আচ্ছা ঘুম তোদের : ধন্যি ছেলে বাবা তোরা—ও ভূতো।

এমন ঘুম মানুষের হয় ?

মা হাতের লণ্ঠনটা ধরে এগিয়ে যেতেই সেটা দপ্-দপ্ করতে লাগলো।

: আ মরণ—আপদ, আবার তেল উঠে দপ্ দপ্ করছে। ওগো শুনছো, একটু এসো তো—আলোটা কেমন করছে।

: এই যে—আসছি—বাবা সাড়া দিলেন।

: কে রে—আলমারীর কাছে ; ওগো চোর, ঘরে চোর ঢুকেছে। কাল ঠাকুরঝির বাড়ীর এঁটো বাসনগুলো পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আজ আমাদের বাড়ী এসেছে—

: ওরে ভজুয়া—আয় শীগগির ও মেধো—

: ও মা—কি হবে !

বাবার হাতে টর্চের আলো অব্যর্থ লক্ষ্যে গিয়ে পড়তেই একটা তিলের নাড়ু মুখে বিভীষিকাগ্রস্ত ভূতোর বিবর্ণ মুখ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।

অসহায়ভাবে অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো ভূতো।

: দেখেছ, এই কাণ্ড করেছে—কি হবে ? আর ওকে এক তোলা করে ভাত দেওয়া হচ্ছে !

: মরবে ও—বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন।

: মা, আর করবো না। টপ্ করে নাড়ুটা মাটিতে পড়ে গেল। সত্যি বলছি—ভূতো বাবার পা জড়িয়ে ধরলো।

তারও পাঁচদিন পরে মা গেছেন পুকুরে। ভূতোর সঙ্গে পটলার ভাব হয়ে গেছে। হঠাৎ এতো ভাব সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এরও গোড়ায় কারণ ছিল।

আজ বালী থেকে ঠাকুমা আসবেন। মা তাঁর জন্যে মটর, ছোলা ভেজে, মোয়া করে হাঁড়িতে হাঁড়িতে সাজিয়ে রেখেছেন—ঠাকুমা এ সব খুব ভালোবাসেন।

ভূতো বললে : আমরাও খুব ভালোবাসি। আমাদের না দিয়ে কেবল ঠাকুমার জন্যে রাখা !

: ঠাকুমা এসে আমাদের সব দিয়ে দেবেন। পটলা আশ্বাস দিলো।

: তা হোক-গে। পটলা, তুই তো তিনটে হাঁড়ি নামাবি তার পর যে হাঁড়িটা আছে সেইটেই মটর-ভাজা—। হুস, ভূতো ঠোঁট চোখাল।

: যদি মা এসে পড়েন।—পটলা সাহস পাচ্ছিল না।

: দূর বোকা কোথাকার, তুই একটা ভীতু—ভীতু, মা তো ঠাকুমার জন্যে জল আনতে গেছেন। আসতে দেরী হবে—আর যদি আসেনও, আমি ওয়ান—টু—থ্রি করবো। তুই তক্ষুণি পালাবি, বুঝলি ?

: তোমার আমার সমান ভাগ কিন্তু—পটলা শাসিয়ে দিলে আগে থেকে।

: বেশ, তাই হবে। তুই আগে আন্।

: যাব—দাদা ?

: আমি আছি, কোন ভয় নেই, যা—

: যাব ? পটলার পা কাঁপতে লাগলো ! বাবা উপরেই আছেন। এখনই যদি—

: যা না। কি গাধা তুই—সাহস করতে হয়—বুঝলি ; সাহস করতে হয়।

ভূতো দরজায় দারোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে আর পটলা টিপিটিপি ঘরে ঢুকেছে।

: চট—পট—। এই-রে—বাবা নামছেন, শীগগির নে।—হুড়-মুড়-ধপ্—ঘর-ভর্তি মোয়া, গুড়, নাড়ু, মটর-ভাজা ছড়িয়ে পড়লো। পটলা ওপরেরগুলো না নামিয়েই নীচেরটায় টান দিয়েছে।

: পালা—পালা—। কিন্তু এতো কাছে মটর-ভাজা পেয়ে একটি দানা মুখে না দিয়ে ভূতো যায় কি করে ?

: ওরে শয়তানের দল, আজ তোকে দেখাচ্ছি মজা—বাবা ভূতোর কান ধরলেন।



: ওরে সর্বনাশ, তোরা আমার এই করলি। কলসী কাঁখে মা কাঠ হয়ে গেছেন। পটলা কেঁদে ফেলেছে: আমি করিনি, দাদা বলেছে—

: তুই সব নষ্টের গোড়া—বাবা গর্জন করে উঠলেন। আমার ছড়িটা আন্-তো—ভূতোর সামনে সব যেন মটর-ভাজার মতো গোল হয়ে গেল।

: ও বৌমা, ও দামু—ঠাকুমা এসে পড়েছেন, গঙ্গাজলটা ধরো তো মা। একি, দামু তুই একটা পাষণ্ড—এই রোগা ছেলেটাকে—আয় দাদা আয়--

বাবার হাতটা একটু শিথিল হবার ফাঁকে ভূতো ছুটে গিয়ে ঠাকুমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।—

: ও কি করেছে জানো না, চুরি করে মটর-ভাজা—বাবার মুখের অসমাপ্ত কথা শেষ হতে না দিয়েই ঠাকুমা বললেন: খাবিই তো, আমি তোর জন্যে কাশীর বড়ো বড়ো কাবুলী-মটর ভেজে এনেছি—। দিন-রাত পুতু-পুতু—ওতে কি ছেলে-পিলে বাড়ে—আমি তোকে অরিবোলা করে দিলাম—তোর যা মনে চায়, খাবি—আর তোমরা যদি কিছু বলো, তাহলে আমি আর এখানে একদিনও থাকবো না—

ভূতো ঠাকুমার কোলে বসে চোখ দুটো লাট্টুর মতো ঘোরাতে লাগলো—বিজয় গর্বে।

টাক আর টাকা

কেষ্টা বললে : টাক থাকলেই বুঝতে হবে লোকটার খুব টাকা আছে।

বাবলু হাত দিয়ে লেত্তি পাকাতে পাকাতে বললো : তোর মাথা!—যত সব বাজে কথার আণ্ডিল তুই! আমাদের চাকর কেলোর তো মাথা-ভরা টাক, তা হলে কি বুঝতে হবে ওর খুব টাকা?

: নিশ্চয়! একশোবার!—মাথার চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আলতোভাবে চুলগুলো নাড়তে নাড়তে কেষ্টা বললে : জানিস, আমার এক মামা থাকেন বোম্বাইএ, ভারী পণ্ডিত তিনি। একদিন আমাদের ডেকে বললেন : জানিস?—টাকা কথাটার উৎপত্তি টাকের থেকেই। নিজের টাকে হাত বুলোতে বুলোতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন তিনি।

: তুই বিশ্বাস করিস এমন একটা কথা?—বাবলু বললে।

: করবো না কেন? বোম্বায়ের মামা যে খুব টাকাওলা লোক তা সবাই বলে। কিন্তু এ টাকা হলো কি করে জানিস্? সে খুব মজার গল্প রে!—কেষ্টা একটা ইট পেতে বসলো বেশ ভব্যিযুক্ত হয়ে : বোস্—বোস্! অমন দাঁড়ের ময়নার মতো উবু হয়ে থাকলে কি গল্প হবে? একটা ইট পেতে বসে পড়্।

একটা গোবর মাখা ইটে বসতে গিয়ে বাবলু বললে : যা—প্যান্টটা নষ্ট হয়ে গেল। বল্ দেখি তোর গল্প!

কেষ্টা বললে : মামার মাথায় একবার একটা মস্ত বড়ো তাল কি করে যেন খসে পড়লো, আর তারই প্রচণ্ড আঘাতে মামার মাথার সব

চুল আস্তে আস্তে ঝরে পড়তে লাগলো—কবির ভাষায় যাকে বলে —"শুধু পত্রঝরা"। তারপর খানিকটা মাথা চুলকে বললে—তারপব যেন কি রে? যাক্ গে, কবিতা—যখন ভুলেই গেলাম তখন আর ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কি হবে? মোদ্দা কথা, এমন চুল উঠে যেতে লাগলো—যেন মাথা নয়, একেবারে সিমেন্ট বাঁধান রাস্তা! মামার তো ভারি মুস্কিল। তাঁর অফিসের বড়ো সাহেব আবার টাক মোটেই পছন্দ করে না। কাজেই এখন করেন কি? মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। সারাদিন বসে বসে ভীষণভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাতে আরো মাথা গরম হয়ে সব চুল মরে গিযে তরমুজের বোঁটার মতো একগোছা চুল শুধু জেগে রইলো। বোম্বাইয়ের মামার আর রাতে ঘুম নেই—দিনে খাওয়া নেই। শেষে একদিন ঠিক করলেন যাত্রার দলেব একটা পরচুলা যোগাড করবেন।

সহরে "দ লিট্‌ল যাত্রা পার্টী" এসেছে। তাদের দলের রাজার চুল নেই; শুকোতে দিযেছিল, গরুতে খেযে ফেলেছে। তারা দরকার পড়লে দাড়ি দিযেই চুল বানায়। বোম্বের মামা তাদের ধরে পডলেন।

: স্যর, আপনাদের পরচুলাটা দিতেই হবে। আমার আজ নেমন্তন্ন আছে সাহেবের বাড়ী।

: কি বললেন? পরচুলা! সে তো নেই—আপনাদের দেশের রাক্ষুসে গরুতে খেযে নিযেছে। আমরা দাড়ি দিযে চুলের কাজ চালাই।—রাগের চোটে ম্যানেজার বললে।

: তাই দিন: আমি নেমন্তন্ন খেযে এসে ফিরিয়ে দেব আবার।—মামা ব্যাকুল প্রার্থনা জানালেন।

: আর যদি না দেন--খেয়ে ফেলেন?

: আমি কি গরু—? মামা চটে উঠলেন।

: আহা-হা, চটেন কেন! গেলে তো আমারই যাবে। আপনার

মাথায় তো শিরিষ কাগজ ঘষা—এমন ভরসা নেই যে একগোছা চুল দিয়ে সাহায্য করেন, শেষে আমি মরি আর কি !

: না-না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি আপনার জিনিস ঠিক ফিরে পাবেন না।—মামা খুব জোর দিয়েই কথাটা বললেন।

সাহেবের মেম খুব আমুদে লোক। আর ইণ্ডিয়ান জিনিসও খুব পছন্দ করেন। ফলের মধ্যে সব কিছু সম্পর্কে তাঁর খুব আগ্রহ। একদিন তিনি মামাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন তাঁর বাড়ীতে কোন্ ফল হয়। মামা চারটে গোলাপ জাম এনে দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন। বললেন—এটা কি মিষ্টার ?

মামা একটু বুদ্ধি খরচ করে ইংরাজী করে বললেন : গোলাপ জাম —মানে রোজ্ জ্যাম।

: আই-সি—বলেই মেম সাহেব খোসাটা ফেলে ভেতরের মারবেলের মতো বীচি দুটো কুচ্ কুচ্ করে খেতে লাগলেন। তার পর থু-থু করে মুখের থেকে ফেলে দিয়ে বললেন : ভেরি ব্যাড্ রোজ জ্যাম, মিঃ। মামা ভীষণ অপ্রস্তুত। মেম সাহেব রেগে গেছেন, সাহেবেরও বোধ হয় রাগ হবে এ-সব বাজে জিনিস খাওয়াবার জন্যে। ভয়ে তিনি কেন্নোর মতো গোল হয়ে গেলেন।

যতই মিষ্টিমুখে বোঝাতে চান ততই মেম সাহেব রং-মাখা ঠোঁট চুষে চুষে বলেন : নো—নো মিঃ, ভেরি ব্যাড্।

তারপর থেকে তিন মাস মেম সাহেব হাঁপানীতে ভুগলেন আর সাহেব রেগে পাঁপড় ভাজা হয়ে রইলেন। আবার ভাব হয়েছে এতদিন পর। কাজেই মামার মন খুবই খারাপ। চুল তাঁর চাই-ই চাই। যদি টাক দেখে মেম সাহেব আগুন হয়ে যান—তখন ?



বেশ করে দাড়ি মাথায় লাগিয়ে বোম্বাইয়ের মামা যখন ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আর কোথায় যায়—মেম সাহেবের কুকুরটা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। কি জানি, ওর আবার কি হলো? মামা বড্ড ভড়কে গেলেন। কিন্তু কুকুরটা ছোট হলে কি হবে—একেবারে ধানি লঙ্কা; —তাঁর পেছনে পেছনে এমনভাবে ছুটলো যে আর বলবার নয়। মামা ভয় পেয়ে এ-ঘর—ও-ঘর—সে-ঘর ছুটে যখন হয়রাণ হয়ে পড়লেন তখন এক ছুটে গিয়ে একটা ধুসো কম্বল টেনে নিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়লেন। আর কুকুরটা মাথার কাছে বসে চৌকীর পায়ার সঙ্গে মাথা কুটে কুটে কেঁদে একেবারে রক্তগঙ্গা করে ফেললো।

হঠাৎ মেম সাহেব ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন।—বলেই কেষ্টা একটু থামলো।

বাবলু এতক্ষণ যেন গোগ্রাসে গিলছিল সমস্ত জিনিসটা। হঠাৎ উত্তেজনার বশে জিজ্ঞাসা করলে—তারপর?

কুকুরের মতো খ্যাঁচ্ করে কেষ্টা বললে: তার পর মানে কি? একজনের অপমানের কথা শুনতে তোর খুব ভালো লাগে, না?—তুই তো ভারি খারাপ লোক!

এ ধরনের আক্রমণের জন্যে বাবলু মোটেই তৈরী ছিল না, বললে—তাই না বটে! ক'দিন ধরে মামার গল্প শোনাবার জন্যে মাথা কুটোকুটি, আবার এখন বলে কি না আমিই দোষী! যা—শুনবো না তোর মামার গল্প। ভারি তো টাক! অমন টাক আমি ঢের ঢের দেখেছি। আমার দিদিমার মাথায়ই মস্ত বড়ো টাক, তাতে রোদ পড়লে মরুভূমিতে মরীচিকার মতো বোধ হয়।

হঠাৎ কেষ্টা যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে: শোন ভাই, আর একটুখানি বাকী আছে।

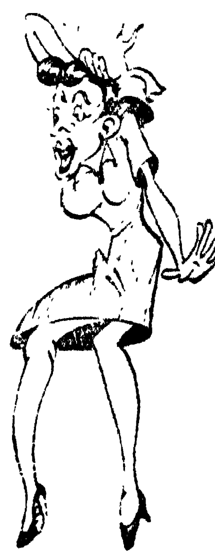
দর বাড়িয়ে বাবলু বললে: না, কিছুতেই শুনবো না।

কেষ্টা রেগে নিজের মনেই বলতে লাগলো : মেম সাহেব ঘরে এসেই উচ্চিংড়ের মতো গলায় কি যেন বললেন। তারপর টপ্ করে একেবারে সেই ঢাকাটা খুলে দিয়ে বললেন : হ্যালো মিঃ!—বলতে বলতেই সাহেব পেছন থেকে এক টানে একেবারে চুলটা খুলে নিলেন। আর কোথায় যায়! ব্যবস্থা যেন করাই ছিল। ব্যথিত কুকুরটা এক লাফে সেই দাড়ি নিয়ে এক ছুট। ছুট মানে কি? ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দিলেও ওর মতো জোর দৌড়োয় না।

বাবলু ঘন হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলে : কুকুরটার চুলের ওপর অত রোখ কেন?

: আর জন্মে নিশ্চয়ই ও যাত্রাদলে রাজার পার্ট করতো—নইলে ওই চুলের ওপর অমন রোখ থাকে?—খুব গম্ভীর মুখে জবাব দিলে।

: তারপর?



: তারপর আর কি? মামার সমস্ত সম্মান, মান একেবারে কূর্ম গড়াগড়ি—

: কেন?—প্রশ্ন করলে বাবলু বেশ অবাক হয়েই।

: কেন মানে?—কিভাবে মামা সেই দাড়ি এনেছিল মনে নেই! কাজেই হঠাৎ মামা এমন জোরে ডুকরে কেঁদে উঠলো যে মেম সাহেব একেবারে অজ্ঞান আর তার সাহেব বাবাজী তো একেবারে স্তম্ভিত। শেষে সব কথা শুনে বললেন, সরি—

মামা কিন্তু মোটেই সরি নন, তিনি কোর্টে দিলেন কেস ঠুকে। আর যায় কোথায়? মেম সাহেব একেবারে কচুটি। জজের আবার চুলের ওপর খুব দরদ এবং যাত্রাদলের অধিকারী তাঁর কাকা। তিনি বললেন মেম-টেম

বুঝি না। চুল যাওয়া মানে প্রাণ যাওয়া! একি চাট্টিখানি কথা?



বেণী নাপিতকে ডেকে কাট মেম সাহেবের চুল। মামা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: আলবাৎ, এ যে আমাদের ভীষণ অপমান। কিভাবে এর প্রতিকার হতে পারে!

মেম সাহেব বললেন: চুল দেব না কিছুতেই—টাকা দেব।

বোম্বাইয়ের মামা বোম্বাই প্যাঁচ দিলেন, বললেন: ম্যাডাম, পাঁচশো টাকা নগদ দিতে হবে।



খ্যাচ করে একটা চেক লিখে দিয়ে মেম সাহেব বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ?

সেই টাকা থেকে পরচুলা কিনে যাত্রাদলে মামা দান করলেন—আর বাকী টাকা দিয়ে টাকের তেল আবিষ্কার করে বিক্রি করতে লাগলেন। তাই বলছিলাম রে বাবলু, এই এক শিশি তেল মাথায় মাখ—দেখতে দেখতে টাক এবং নির্ঘাৎ টাকার তোড়া তার সঙ্গে। তুই দেখে নিস্ আমার কথা—!

গল্প করবে অঙ্ক নয়

সকালবেলা বসে বসে ঝঁ্যাটা-গুঁফো বেচু মাষ্টারের কাছে তেল মাথা লাঠির ওপর বাঁদরের ওঠা-নামার অঙ্ক করছিলাম, এমন সময় ছোটবোন মিনি খবর দিলে, শ্যামনগর থেকে পিসিমা আজ সকালের গাড়ীতেই আসছেন।

মাথা চুলকে বীরু বললে, স্যার—ষ্টেশনে যাব !

নাকের ওপরের নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা একেবারে ডগায় এনে একটা ভেংচি কেটে আর ঘোঁৎ ক'রে মুখে একটা আওয়াজ তুলে স্যার বললেন : লেখ শীগগির তিন নম্বর চৌবাচ্চার অঙ্ক, একটা চৌবাচ্চার দুটো নল—বলতে বলতে চৌবাচ্চায় হাবুডুবু খাওয়া বীরু আর দীপুকে উদ্ধার করলেন শ্যামনগরের পিসিমা। ডান হাতে একটা ঘটি, বাঁ হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে দরজার কাছে ছেলে দুটোকে পড়তে দেখেই সুরু করলেন : হ্যাঁ গা, তুমি কেমন মাষ্টার ? বেলা দশটা বেজে গেছে এখনও তুমি ছেলে দুটোকে দিয়ে চৌবাচ্চা ধোয়াচ্ছ ? ওরা কি জমাদার ?

দীপু আর বীরু যেন অকূলে কূল পেলো। মাষ্টার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অনুমতির অপেক্ষা করে রইলো।

: চৌবাচ্চা ধোয়ার ব্যাপার নয় পিসিমা—ও অঙ্ক—

: তুমি থামো বাছা—ও সব অঙ্ক আমি খুব বুঝি—হ্যাঁ, অঙ্ক করতো আমার দাদু, অঙ্ক বলে অঙ্ক, অঙ্কের ঠাকুরদাদা—মানে মানস-অঙ্ক—খাতাও লাগতো না, বইও না—মুখে মুখে হিসেব।

পিসিমার মতে শ্যামনগর একটা বিচিত্র এবং অদ্ভুত দেশ।

সকালবেলা—রবিবারের দিন—দীপু আর বীরু পিসিমাকে ধরে বসলো : এবার গল্প বলো পিসিমা। পিসিমার কোন কাজ নেই। চুপ করে বসে থাকা তাঁর পোষায় না। তিনি গল্প বলবার জন্যে যেন তৈরী হয়েই আছেন। কাজেই বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করলেন : আমি যখন প্রথম শ্যামনগরে যাই, তখন সেখানে একরকম পাখী দেখেছিলাম! ওমা, কি বলবো তোদের—সে পাখীটা দেখতে ঠিক কুকুরের মতো। আবার ডাকে কট্-কট্ করে—বড়ো বড়ো ঠোঁট। আমাদের নারকেল গাছেই যে বাসা বেঁধেছিলো—আমরা কি তা জানি। একদিন দেখি ঝড়ে উঠোনের ওপরে পড়ে আছে সেই পাখীর একটা বাসা ভেঙে, তুলে দেখি তাতে পাখীটা কি সুন্দর আলোর ব্যবস্থা করেছে। সূতো দিয়ে তার বানিয়েছে আর গোবর দিয়ে জোনাকী পোকা এঁটে ঘর আলো করেছে—সে এক আশ্চর্য পাখী—

: কি নাম সে পাখীর, পিসিমা?—ছানাবড়ার মতো চোখ করে বীরু আর দীপু এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

: সে যেন কি, আমার মনে নেই, একটা ইংরিজি নাম—আমার ঠাকুরপোর ভাগ্নের বন্ধু জানে।

দীপু আর বীরুর খুব ভক্তি হলো শ্যামনগরের পিসিমার ওপর। কেমন বিচিত্র জায়গা শ্যামনগর!

ইস্কুলে যেতে যেতে দীপু বললে : দেখেছিস্ পিসিমার কত জেনারেল নলেজ। সাধারণ জ্ঞানে নিশ্চয় পিসিমা ফার্ষ্ট হবে।

: হ্যাঁ রে—বীরু বললে, তুই দেখিস্ অঙ্ক-স্যারও পারবে না পিসিমার সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানে। বীরু অঙ্ক পারে না বলে অঙ্কের মাষ্টারের ওপর একটু বিরূপ।

ক্লাশে মাষ্টারমশায় লিখতে দিলেন—"পাখীর সম্পর্কে যাহা জানো লেখো"—আর যায় কোথায়, অমনি দীপু লিখলো—"পাখী অনেক

রকমের আছে। শ্যামনগর বলে মাদাগাস্কারে একটা জায়গা আছে সেখানে এক রকমের আশ্চর্য পাখী থাকে। কুকুরের মতো ডাকে—আর মূলো খায়। বাসায় সুতো দিয়ে তার টাঙিয়ে তাতে গোবরের মধ্যে জোনাকী পোকা পুঁতে রেখে রাতে ঘরে আলো করে—”

হেডমাষ্টার দীপুকে ডেকে পাঠালেন—ঘরে বসে দীপুর বাবা।

: এসব কি লিখেছ, খাতায় ?—বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

: কেন, পিসিমা যে বলেছেন—দীপু ভয়ে ভয়ে বললো।

পিসিমা বলেছেন—বেত মেরে ঠাণ্ডা করে দেব! হেড মাষ্টার গর্জন করে উঠলেন।

বীরু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে : আর করবো না স্যার।

কুলতলায় বসে বসে বীরু আর দীপু আলোচনা করছিল। আর পিসিমার গল্প শুনবো না। সব বাজে কথা।

বিকেলে দিল্লী থেকে ছোট কাকা এসে পড়লেন। দীপু আর বীরুর ভীষণ প্রিয় এই ছোট কাকাটি। ছুটিতে এলে হৈ-হৈ করেন, একেবারে বাড়ী মাথায় করে তোলেন। আবার শ্যামনগরের পিসিমা কোন দিনই ছোট কাকাকে দেখতে পারেন না। বাড়ীতে ঢুকেই ছোট কাকা পিসিমাকে দেখে একেবারে একটা আনন্দধ্বনি ছাড়লেন : হ্যালো—শ্যামনগরের পিসিমা যে। কবে এলেন ? তারপর আপনার গল্প-পিসির আসর-টাসর বসছে কেমন ?

পিসি বললেন : তোর যত কথা! গল্প আবার কবে বললাম ? পেছনে লাগা স্বভাব কি তোর কখনও যাবে না-রে ? বড়ো হলি, কলেজে পড়াচ্ছিস, সেই আগের মতই রইলি। পিসি ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে চাইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, যাই—কুটনোটা কুটে দিয়ে আসি। বলেই উঠে গেলেন।

রাতে দীপু আর বীরুর কাছ থেকে সব ব্যাপারটা শুনে ছোটকাকা বললেন—দাঁড়া, এর মজা দেখাচ্ছি পিসিকে।

এই বলেই কাকা পিসি যে ঘরে ছিলেন সেখানে গেলেন।

: পিসি কাল আমার এক বন্ধু আসবে দিল্লী থেকে, সে খুব সুন্দর ম্যাজিক দেখাতে পারে। সবাই তাকে নর-রাক্ষস বলে। সে ম্যাজিক দেখাবার সময় জ্যান্ত মুরগির মাথা ছিঁড়ে রক্ত খায়—তারপর সাপ খায়—ব্লেড খায়।

: ওমা—ওসব নর-রাক্ষস টাক্ষস মানুষ খাবে না কি, কি জানি বাবা!

: তোমাকেও খেতে পারে পিসি—সাবধান।—পিসি-মাসি দেখলে আবার সে ভারি রেগে যায় আর মাথা যদি গরম হয় তা হলে যে কি



করতে পারে বলা যায় না। আগেই বলে রাখলাম, সাবধান—পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না। দীপু আর বীরু মুখে রুমাল পুরে দিলো।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দীপুর বাবা আর মা কীর্তন শুনতে গেছেন। আসতে দেরী হবে। শ্যামনগরের পিসিমার ওপর বাড়ীর ছেলেপুলেদের খেতে দেবার ভার। ছোটকাকা দীপুকে আর বীরুকে যেন কি শিখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পিসিমা বললেন : ওরে বীরু, সে রাক্ষস-টাক্ষস তো আমায় কামড়াবে না ? কি জানি বাবা। শ্যামনগরের শেয়ালের কামড়ে তিন মাস ভুগেচি, ওসব রাক্ষস-খোক্কসে আমার ভারি ভয় করে। আর এসে পড়লে ওপাড়ার বিন্দির বাড়ী চলে যাব।

বলতে বলতে বাইরের দরজায় যেন কালো কদাকার একটা লোক হুপ করে পড়লো। তার মুখটা ঘোর কালো তার ওপর বড় বড় দাঁত —পিসির দিকে যেন কেমন করে তাকিয়ে রইলো—

: পিসি, এই যে নর-রাক্ষস এসেছে—তোমার কাছে সেই আশ্চর্য গল্পটা শুনতে চায়—

: ওরে—বাপ রে—ও দীপু আমায় এক্ষুণি দিয়ে আয় আমার নাতনীর বাড়ী। জিনিস পরে নেব—

: ও পিসি যেও না—অন্তত পাখীর গল্পটা বলে যাও—দীপু বললে।

কিন্তু পিসি আর দাঁড়ালেন না। পেছনের পুকুর পাড় দিয়ে টেনে দৌড় দিলেন। কিন্তু সেই ছোট কাকার অদ্ভুত বন্ধু তাঁকে ছাড়লো না, তাঁর পেছনে পেছনে দিব্যি মানুষের গলায় : গল্প—গল্প শুনবো, বলে ছুটলো। ততক্ষণে পিসি একেবারে নাতনীর বাড়ী।

নর-রাক্ষস ফিরে এলো। মুখোসটা খুলে রেখে বললো—পিসি কি ভীষণ জোরে ছুটতে পারে রে !

: ছোটকাকা, বাবা-মা এসে রাগ করবেন না ? দীপু বললে।

: তোরা যেন বলিস না যে ছোটকাকা নিজেই নর-রাক্ষস সেজে শ্যামনগরের পিসিমাকে তাড়িয়েছে।

: মা যদি জিজ্ঞেস করেন—কি বলবো ? বীরু বললে।

: বলিস্, ছোটকাকা সব জানে। বৌদি আমার ওপর কিছুতেই রাগ করতে পারবে না। অনেকদিন পরে এসেছি তো।

আর বৌদি এসব শুনলে—বীরু বললে : গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলবে।

নেমন্তন্ন নিয়ে ব্যাপার

গণকঠাকুর আমার হাত দেখে অনেকক্ষণ চিন্তা করে ছুটি ভুরু কুঁচকে বললেন : তোমার কপাল নেহাৎ মন্দ নয়, তবে কিনা নেমন্তন্ন খাওয়ার রেখাটার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে।

আমি আবার নেমন্তন্ন খাবার খুবই ভক্ত, সুতরাং কথাটা শুনেই আঁতকে উঠলাম। আমি তো জীবনে কখনও ঠাকুরকে মানত করে ঠকাইনি বা ঠাকুমার ঘরের কুলের আচার চুরি করেও খাইনি ; তবে কেন আমার কপালে নেমন্তন্নের বেলায় এমন বিভ্রাট ?

কিন্তু পরে দেখেছি গণকঠাকুরের অন্য কথা ফলুক আর না-ই ফলুক, এ কথাটা আমার ক্ষেত্রে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। আজ সেই কথাটাই বলবো।

রকে বসে ছুঁচোর মতো মুখ করে হাঁটু বাজিয়ে গাইছিলাম : 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'—মানে মনটা কেমন যেন একটু উদাস উদাস ঠেকছিল ক'দিন থেকেই। গানটা যতই দরদ দিয়ে গাইছিলাম গলা দিয়ে আবেগে চার-পাঁচ রকমের বিকটমতো সুর বেরুচ্ছিল, কি জানি কেন ! কিন্তু কি জানি কেন-ই বা বলছি কেন ? আমার এমন হরিরলুটের গান গাওয়া গলা সে তো নষ্ট হবার নয়, তবে একটা কারণ হতে পারে—আর হতে পারে কেন, সেইটেই ঠিক। কাল যখন ভজাদের বাড়ীতে হরিরলুটের সময় গান ধরেছিলাম—'লুট পড়েছে লুটের বাহার লুটে নেয়ে তোরা, চারদিকে খোলকরতাল বাজে, মধ্যে নাচে ঘোড়া—' এবং এই গানটা প্রাণপণে বাতাসার থামার দিকে তাকিয়েই

গাইছি, অমনি কোথা থেকে শিবুমামা এসে আমার ঘাড়ে রদ্দা মারলে ; রদ্দার চোটে সামনে তাকিয়ে দেখলাম শিবুমামার ভুঁড়িওয়ালা মেজো জ্যেঠামশায় সবার মাঝখানে ঘোড়ার মতই লাফাচ্ছেন।

: আরে ঘোড়া নয়, গোরা—মানে গৌরাঙ্গ।···শিবুমামা আমার গানের ভুলটাকে শুধরে দিতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু গলাটা সেই যে ভাঙলো আর জোড়া লাগলো না। গানের গলা জোড়া না-ই লাগুক তাতে নেমন্তন্ন খেতে কি অসুবিধা ? কিছুই না।

একদিন ধরে পড়লাম শিবুমামাকে। টাকা ধার চাইবার সময়ের মতো মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বেশ মোলায়েম করে বললাম : মেরেছ রদ্দা, তাই বলে কি একদিন নেমন্তন্নও খাওয়াবে না—এ কি নিষ্ঠুরতা ?

শিবুমামার মনটা যে কোন কারণেই হোক খুব ভালো ছিল। কাজেই আমার কথাটা ওর বেশ মনে লাগলো এবং কেমন যেন ভড়কেও গেল।

: নেমন্তন্ন খাবি বলছিস ? বেশ ! কাল আমার এক বন্ধুর বিয়ে। খুব অনুরোধ করেছে যাবার জন্যে, তোকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে।

: আমায় তো আর তোমার বন্ধু নেমন্তন্ন করেনি !—ভারি ব্যথিতচিত্তে উত্তর দিলাম।

: না-ই করলো। বাড়ীর সবাইকে কি ও চেনে ? কিন্তু দেখ চিঠিতে কি লিখেছে—"সপরিবারে যোগ দিবেন"। জানিস্ তো —পরিবারে তো আর একজন লোক থাকে না, থাকে অনেক। শুধু তোকে কেন, ইচ্ছে করলে আরো অনেক লোক সঙ্গে নিতে পারি। সেটা আমার ইচ্ছে। তারপর দেখ, কত অনুরোধ করেছে। পরিষ্কার ছাপার অক্ষরে লিখেছে, "পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন"। যদি না যাই তা হলে ওরা মনে করবে আমি ত্রুটি মার্জনা করিনি। শুধু শুধু কি ওদের মনে দুঃখ দেওয়া উচিত ? তুই-ই বল ? তারপর স্পষ্ট করে বলেছে—"লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ

প্রার্থনীয়"। ওরা কি ভালো লোক! কিছুই চায় না। শুধু একটু আশীর্বাদ। সেটা না দিলে কি মান থাকে, বল?···বলতে বলতে শিবুমামা যেন কেমন চটে উঠে আমার লম্বা লম্বা কান দুটো কেমন টেনে ধরলেন।

: উঁহু—হুঁ, আমি কি আশীর্বাদ করবো না বলেছি? আলবাৎ করবো—প্রাণপণে করবো। কিন্তু তুমি আমার কান ছাড়ো, নইলে প্রাণ যাবে যে!

এতে শিবুমামা যেন একেবারে মানকচুর মতো কোমল হয়ে গেল।

: তা তো করবিই—আশীর্বাদ করা উচিত। আর আশীর্বাদ করতে যখন কোন খরচা নেই; তবে কি ব্যাপারটা বিতং দিয়ে বুঝিয়ে বলছিলাম, নইলে সব ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবি কি করে?—বলতে বলতে শিবুমামার হঠাৎ চোখ পড়লো হাতে বাঁধা আম-পাড়া ঘড়িটার দিকে (ঘড়িটা এতবড় যে ইচ্ছে করলেই ওটা দিয়ে আম-পাড়া যায়) আর সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দিয়ে উঠলেন : চল—চল, এখুনি যেতে হবে। দূরও অনেক—সেই গড়িয়া। যেতে যেতেই সন্ধ্যে। তার ওপর ঠিকানাটা আবার গেছি ভুলে। তবে নেবো'খন চিনে। ওটা বেশী শক্ত কাজ নয়। হ্যাঁ, ভদ্রলোকের নাম—? তা-ও তো ঠিকমতো মনে নেই।···মাথা একটু চুলকে বলতে বলতে চললেন : তা হবে'খন—তা হবে'খন।

এমন সময় ঢংঢঙিয়ে একটা ট্রাম ছুটে আসতেই আমাকে আলুর বস্তার মতো পাঁজাকোলা করে ট্রামে তুলে নিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ীর দিকে রওনা হলো। গড়িয়াহাট গিয়ে ট্রাম ছেড়ে উঠলো বাসে।

গড়িয়ার মোড়ে এসে বাসটা দাঁড়াতেই শিবুমামা বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠলো : বাঁধকে—বাঁধকে জননী হ্যায়?

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম। চারদিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : এর মধ্যে আবার জননী কে?

: আরে রাষ্ট্রভাষায় জননী মানে মহিলা। ওসব না বললে তো আর ওরা বাস থামাবে না। আর আমার বেতো পা নিয়ে আমি একটা আছাড় খেয়ে মরি আর কি! এখন মেলা বাজে বক-বক না করে নেমে পড়ো তো দেখি।—বলেই আমার পায়ের ওপর ভরসা না করেই আমাকে এক হেঁচকা টানে নামিয়ে ফেললে এবং সোজা পথে চলন্ত একদল লোকের সঙ্গে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হেঁটে চলতে লাগলো।

: এ কি! তুমি যে ওদের সঙ্গে চললে? বিস্ময় প্রকাশ করি।

: আরে এত লোক হন্তদন্ত হয়ে যখন চলছে তখন ওরা নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন-বাড়ী যাচ্ছে। তাছাড়া আমার কাকীমা বলেন—"শিবু, মনে রাখিস একটা নীতিকথা—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" সেই থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—যেখানেই যাই, একদল লোক যেখানে যাবে সেখানেই যাবো।

আমার চোখ কপালে ওঠে। কিন্তু শিবুমামা ছাড়বার লোক নয়, আমার শোনার অপেক্ষা না করেই বলে চললো: একবার বিলাইচণ্ডী ষ্টেশনে নেমে দেখি একদল লোক মাথায় বড়ো বড়ো বাক্স নিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছে। আমিও কাকীমার আদেশ ও নির্দেশ মতো ওদের সঙ্গ নিলাম। ওরা চলতে চলতে একটা বেশ বড়সড় গোছের জমিদার-বাড়ী গিয়ে উঠলো। আমায় কেউ-ই লক্ষ্য করলে না লোকের ভীড়ে। দিনে খাওয়া দাওয়া বেশ হলো—কিন্তু রাতেই পড়লাম মুশকিলে। ওরা রাতে কোন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা না করেই আমায় বেশ ভালো করে হনুমান সাজিয়ে দিলে! আমি যতই তিড়িং-বিড়িং করি ওরা ততই হাততালি দিয়ে বলে, 'বাঃ—বাঃ; পাকা অভিনেতা।' আমি যেই রেগে লেজটা টেনে খুলতে গেছি অমনি একটা খড়খড়ে গলার লোক বিশ্রীভাবে লাঠিখেলার মতো হাতটা আমার মুখের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে, 'এটা বিখ্যাত বিরিঞ্চিদাস অপেরা। জমিদারবাড়ী তিনদিনের বায়না নিয়েছি। আসবার সময় ভুলে হনুমানকে সঙ্গে

আনা হয় নি। জমিদারের আবার সখ—লঙ্কাদহন পালা তিনি প্রথম দিনই শুনতে চান। হনুমান ছাড়া তো তা চলবে না। ভাগ্যিস্ তুই এসে গেছিস্। আহা, কি মানিয়েছে—যেন আমার দলের জন্যেই তৈরী হয়েছিস্। যাঃ—আর ফ্যোৎ ফ্যোৎ করে কাঁদিস্ না—আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নেমে পড়।'

ওঁকে আমি করজোড়ে বললাম, 'আমি থিয়েটার করতে পারি না স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন।'

লোকটা বললে, 'পারি না স্যার! তবে এলি কেন? আর এক পেট গিললি কেন? হনুমান না সাজলে এরা আজ আমাকে মেরে তক্তা করে দেবে। যা—যা, নইলে এখুনি তোর একদিন কি আমার একদিন।' কি করি, যেই হনুমান হয়ে স্টেজে নেমেছি আর যায় কোথায়, সবাই একযোগে হো—হো করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওরে লেজকাটা হনুমান—। লেজ নেই—ভু—ও।' সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ইঁট-পাটকেল পড়তে লাগলো।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম: তা তো হলো—এখন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবো। আমাদের কি হবে? যার বাড়ী যাবো তাঁর নামটা কি?

: ওই, সে কী জানি—কি। বল না রে?—বলেই আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে নিজেই বিব্রত হয়ে পড়লো।

: আমি কি করে জানবো?—আমি বিরক্ত হয়ে বললাম: না জানো বাড়ীর কর্তার নাম—না জানো বাড়ীর ঠিকানা। আজ যে আমাদের কপালে কী আছে—কে জানে!

: কি বললি, এই শিবেশর্মা সব পারে, তুই দেখে নে। শুধু চলতে চলতে লক্ষ্য কর, কার বাড়ীর সামনে সামিয়ানা টাঙানো, আর কার বাড়ীর সামনে চেয়ার পেতে ফরসা ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবী পরে হাসি হাসি মুখ করে আকাশের দিকে চেয়ে লোক বসে আছে।

বলতে না বলতেই শিবুমামা বললে : দেখ—দেখ, এই বাড়ীটার সামনে চেয়ার পেতে লোক বসে আছে—আর মাথার ওপরও ব্যাঙের ছাতার মতো সামিয়ানা টাঙানো। আলবাৎ এইটা বিয়ে-বাড়ী হতেই হবে!—বলতে বলতে আমার হাত ধরে একটা চেয়ারে যেই বসতে গেল অমনি কতকগুলো লোক জগাই-মাধাইয়ের মতো হাত করে নাচের ভঙ্গিতে বললে : ওপরে—ওপরে—

শিবুমামাও ছাড়বার পাত্র নয়। আমার হাত ধরে সোজা ওপরে উঠতে যাবে অমনি এক ভদ্রলোক পথ আটকালো ; বললো : কাকে চাই—? গলার স্বর যেন ভাঙা মোটরের স্টার্টারের মতো।

: মানে—মানে—, শিবুমামা কি নাম বলবে ভেবে পেলো না।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হাঁক দিলে : ভজুয়া—বাড়ীমে ছিঁচকে চোর আয়া—আভি চক্ষের পলকে ডাণ্ডাসে ঠাণ্ডা কর—

আমার তো হাত-পা কাঁপতে লাগলো, কিন্তু শিবুমামা ভড়কাবার লোক নয়। টপ্‌ করে আমাকে বগলদাবা করে একেবারে সদর রাস্তা। তারপর যেন হাওয়ায় মিশে গেল!

"অখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন—শ্রেষ্ঠাংশে লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ ও সঙ্গে বেনারসের তবলচি"—লেখা, একটা বিরাট প্যাণ্ডেলের সামনে এসে দাঁড়ালো শিবুমামা। বুকের ভেতরে যেন কে হাতুড়ি পিটছে। আমি তো কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছি একটা ইটের ওপর বসে। প্যাণ্ডেলের বাইরে কয়েকজন ভদ্রলোক পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল আর ভেতরে বিরাট গণ্ডগোল।

ছুটন্ত লোকগুলো হঠাৎ আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললে সবিনয়ে : দাদা প্রাণ বাঁচান—একটু সামান্য গোলমাল হয়ে গেছে। যা টাকা চান তাই দেবো—একটু আসরে গিয়ে বসতে হবে স্যার। টিকিট করে সবাই বিখ্যাত ওস্তাদ পুটুং সিংএর গান শুনতে এসেছে। তিনি তো অনুপস্থিত। আপনি স্যার কাজটা চালিয়ে দিন।

গান গাইতে হবে না। বলবেন, 'শরীর অসুস্থ, গান গাইতে পারবো না'।

বলতে বলতে কুড়ি-পঁচিশজন লোক আমাদেরকে সমস্বরে বলতে লাগলো : আসুন—আসুন ; আসতে আজ্ঞা হোক—

: এ কি বিপদ রে বাবা !—বলতে না বলতে সেই ঘর্মাক্ত লোকেরা আমাদের নিয়ে ডায়াসে তুলতেই চটাপট হাততালি পড়তে লাগলো।

: এবার গান হোক স্যার ! এক ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে।

শিবুমামা আমার কানের কাছে বিবর্ণ মুখ নিয়ে বললো : এবার আর প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবো না। এদের বিখ্যাত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে এরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে আমাদের জোর করে ধরে এনে আসরে বসিয়ে দিয়েছে—এখন উপায় ?

শিবুমামা যেন মরিয়া হয়ে উঠলো : ধর যা পারিস—আর সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ঘোষণা হলো : এবার গান গাইছেন বিখ্যাত ওস্তাদ পুটুং সিং—তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছেন চিরিমিরিবিখ্যাত তবলচি বোঁচকারাম—

: ধরুন স্যার, আমরা তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছি।

: কেটে পড় না বাবা, তাহলে এ যাত্রা আমরা রক্ষা পাই।—মনে মনে বললাম।

: সুরু হোক স্যার। দশ টাকার টিকিট কিনেছি—নইলে এতক্ষণে সরে পড়তাম।

: ধরুন স্যার ধরুন স্যার—সমবেত কণ্ঠে চীৎকার সুরু হলো। কোলাহল যখন উদারা—মুদারা—তারাতে গিয়ে ঠেকলো—শিবুমামা আমায় তাড়া দিয়ে বললো : ধর না ছাই একটা কিছু—ভয়ে তো আমার কিছুই মনে পড়ছে না। তবে এখন করি কি !

ভয়ে শিবুমামা কাঁপতে লাগলেন। হঠাৎ মনে পড়লো, ঠাকুমার প্রবল জ্বর হলে তিনি তাঁর বাঁজখাই গলায় জগঝম্প রাগিণীতে

গাইতেন : “আমি যদি মরি ও ঘোর সুন্দরী, ভবে তোমার নাম লবে কেডা”—তখন আমরা তাকে ভেংচি কাটতাম। কিন্তু আজ এই বিপদের মধ্যে সেই গানের কথাই—মানে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সেই গানটাই মামা ধরলো—

শিবুমামা বললে : গান ধরছি, পালাবার পথ দেখে রাখ—বলেই বীরের মতো আমার দিকে তবলাটা এগিয়ে দিয়ে মাইকের কাছে গিয়ে



ভাঙা গলায়—যাকে বলে ঋষভ রাগিণীতে ধরলে : আমি যদি মরি ও হরসুন্দরী—

সভায় যেন বাজ পড়লো। মাথায় লাঠি মারলে যেমন নিচের কচুগাছগুলো নেতিয়ে পড়ে তেমনি চেয়ার থেকে জনাদশেক লোক ভিরমি খেলো। গেটের কাছে একটা এঁটুলি-কাটা দালদায় ভাজা কুকুর উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। গান কানে পৌঁছাতেই সে

"কেঁউ" করে একটা আর্তনাদ করে প্রাণ নিয়ে এমন ছুটলে যে, মনে হলো—সে একেবারে হরিণঘাটায় গিয়ে থামবে। সভায় লোকে যেন এক মুহূর্ত ঝিম্ ধরেছিল—তারপর শিবুমামা ভাঙা গলায় যখন সপ্তসুরের খেলায় গিটকিরিকে টিটকিরি দিতে লাগলো অমনি সবাই স্প্রিংএর মতো লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : ধোপার গাধা সভায় ঢুকেছে —মার—মার।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষযজ্ঞ সুরু হয়ে গেল। আর সেই ফাঁকে বাঁশ টপকে



পেছনের ধোপাপটির বস্তির মধ্যে দিয়ে শিবুমামা আমায় নিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়লো।

একেবারে চালতেতলার মোড়ে এসে থামলো। শিবুমামা গোটা চার আর আমি গোটা দুই বাঁশের বাড়ি খেয়েছি। একটা রকে বসে কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগলাম। একটু সুস্থ হয়ে শেষে বললাম, একেবারে কেঁদে ফেলে : তোমার মনে এই ছিল, শিবুমামা—আজ গোটা দিন গেল না খেয়ে!

: কিছু তো খেলি, পেটে না হয় পিঠে—বলতেই একটা শুটকো মতো বাজে ধরনের গাধা, শিবুমামার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সবই সে শুনেছে আমাদের দশা দেখে হাসি চাপতে না পেরে ডাক সুরু করে দিলে : ইঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ। বোধ হয় ও ওদের ভাষায়



গান ধরেছিল—"তোমায় গান শোনাবো—ওগো ঘুম ভাঙানিয়া—" আর আমি ওর দিকে একটু তাকাতেই দেখলাম ও বেশ চোখটা টেরা করে শিবুমামার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভুতোর জুতো

খ্যাংরাপটি স্ট্রীট দিয়ে নূতন এক জোড়া নাগরা পায়ে দিয়ে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে ভূতো যাচ্ছিল নিমতলায় তার বিনিমাসীর বাড়ী। কিন্তু মামার বাড়ী যাবার ল্যাঠা অনেক। যদিও কিল চড় মামার বাড়ীতে নেই তবু জুতোর কাপড় তো আছে। কাজেই কিল চড়ের শূন্যতার জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই। তাই ভূতো মামার বাড়ী যাওয়াটাই বেশী পছন্দ করে না। তার ওপর ভূতোর ন্যাড়া-মামাটা যেন কেমনতরো লোক। যেন খুনে ডাকাত—ছেলেপুলে দেখলেই যেন তার কান টানতে ইচ্ছে করে। কেন? এতই যদি কান টানবার ইচ্ছে তবে অন্যের ওপর নজর না দিয়ে নিজের কান টানলেই হয়। কারুর আপত্তি করবার কিছু নেই। তা নয়, খামখা অন্যকে ব্যস্ত করা! আর যদি কান টানবার সুযোগ না পায় তাহলেই অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে দেবে। ভূতোর অত সব মোটেই পছন্দ হয় না। ন্যাড়ামামার মোটেই রস বোধ নেই। ভূতো ন্যাড়ামামাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু কথায় বলে "দায়ে পড়ে রায় মশায় হওয়া!" শেষ পর্যন্ত এক জোড়া নাগরার জন্যে ভূতোকে তার ন্যাড়ামামাকে পছন্দ করে ফেলতে হলো তার একটা প্রকাণ্ড বেলের মতো নেড়া মাথা সত্ত্বেও, সেই কথাই বলছি।

ঘুটঘুটে কালো কম্বলের মতো অন্ধকার রাস্তাটা। তার ওপর কারা যেন কলা খেয়ে তার খোসা মানুষের আছাড় খাবার জন্যে ফেলে রেখেছে। দেখে মনে হবে এরা যেন ভূতোকে ফেলবার জন্যেই এই

ব্যবস্থা করে রেখেছে। একটা দাড়িওয়ালা ছাগল গোলাপফুলের গন্ধ শোঁকার মতো সেই কলার খোসা শুঁকে একেবারে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে। ভূতোর মনও যেন কেমন উদাস হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে গান ধরলো, "মা আমায় এমনি করে, শিশুর মতো করে রেখো।" বলা বাহুল্য মা কথাটা কান পেতে শুনলেন এবং প্রার্থনা পূরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে দামুর করিম মিঞার ঘাড়ে পড়বার মতো ধড়াম্ করে একেবারে ছা গ ল টা র ঘাড়ে। ছাগলটা হয়তো প্রথমে ভেবেছিল —ঘাড়ে কলার কাঁদিই পড়েছে;



শেষে ভূতোর "হ্যাঁচ্চো" করে হাঁচিতে একেবারে নির্ভুলভাবে ঘটনাটা অনুভব করে টিকির মতো ল্যাজ তুলে ছুট দিলে। আর নাকের খানিকটা পচা গোবর যেই ভূতো মুছতে যাবে অমনি কে যেন এক ভীষণ হেঁচকা টানে তার পায়ের থেকে নাগরা জোড়া টেনে নিলে।—ভূতো 'চোর-চোর' করে চেঁচিয়ে উঠতেই অন্ধকার ভাঙা হাঁড়ির ওপরে আঁকা ক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁত খিঁচিয়ে চোর বললে "ভূতোর জুতো চোর"। বলেই নাকের কাছে আরশোলার দাড়ার মতো কি দিয়ে যেন একটু সুড়সুড়ি লাগিয়ে, ছাগল যে পথে ছুট দিয়েছিল একেবারে সেই পথ দিয়ে হাওয়া।

কোন রকমে একটা রিকসা চেপে বাড়ী ফিরে ভূতো কেঁদে-কুঁদে বিনিমাসীকে বলতে লাগলো: জানো বিনিমাসী, চোরটা হচ্ছে এক-নম্বরের বাজে লোক, ওর কান দিয়ে নিশ্চয় পুঁজ পড়ে—; ওর নাকটা নিশ্চয়ই হবে আলুকাবলীর মতো আর পায়ে নিশ্চয়ই গোদ আছে।

এ রকম না হলে সে কখনও পরের পায়ের চুরি করা জুতো পরতে পারতো ?

এতগুলো অসুখের নাম একসঙ্গে শুনে বিনিমাসী খানিকটা ভেবে বললে : তা তো বটেই। তবে এত লোক থাকতে তোর পায়ের নাগরাই বা চোরে নিলো কেন ? কত লোকের পায়ে তো কত ভালো ভালো দামী দামী জুতো আছে, এমনটা তো কারুর ঘটতে দেখিনি।

: বিপদে পড়লে সবাই কথা শোনায়—স্পষ্ট দেখলাম আমার পা থেকে আমার নাগরা জোড়া নিয়ে পালালো লাউ-এর বীচির মতো দাঁতওয়ালা একটা ভূতের মতো লোক। তা সত্ত্বেও তুমি উকিলের মতো ভুরু কুঁচকে আমাকে জেরা করছ—কাঁদো-কাঁদো হয়ে ভূতো জবাব দিলে।

: আমি তো কাঁদবার মতো কোনো কথাই বলিনি। তবে খ্যাঁক করে কাঁদবার কি হলো, শুনি ? একটু গরম দুধ খা। খেয়ে ঘরে শুতে যা। ঘুমোলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আজ একলা ঘরে শুতে পারবি, না ঘরে আমি শোব ?

: না কাউকে দরকার নেই—তোমরা সবাই সমান।—ভূতো রেগে বললে।

ন্যাড়ামামা ভূতোর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বিনিমাসী তাকে ডেকে বললে : ভূতোকে একটু দেখ না। ও ভীষণভাবে পড়ে গেছে আর ব্যথাও পেয়েছে—জুতো জোড়া তো গেছেই ;—বিনিমাসী ন্যাড়ামামার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো।

মুখে 'হুম' করে একটা আওয়াজ করে গরুর কান দিয়ে মাছি তাড়াবার মতো শব্দ করতে করতে একটা বাটার চটি পায়ে দিয়ে ন্যাড়ামামা চলে গেল—যেন কিছুই হয়নি ব্যাপারটা।—তুচ্ছ কথা একেবারে এ-সব।

ভূতোর আরো রাগ হলো। ন্যাড়ামামার কি বিচ্ছিরি তাকানো

যেন! অন্যের কষ্ট দেখলে মোটেই তার মনে কষ্ট হয় না। না, মামার বাড়ীতে আর আসবে না। শুধু দাদু আর দিদিমার জন্যেই আসতে হয়, ওঁরা কত কাঁদেন কিন্তু ন্যাড়ামামার ব্যবহার ভূতোর মনে গাঁথা থাকলো।

নিঝুম ঘুটঘুটে রাত। দাদু ঘুমিয়ে পড়েছেন, দিদিমা ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে শুতে গেলেন। ভূতো একটু কাঁদতে আরম্ভ করেছে কিন্তু কান্না চোখেই লেগে রইলো—টুপ করে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অন্ধকারে কে যেন এসে তার গায়ের চাদরটা একটু একটু করে টানতে লাগলো; তারপর খুট খুট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঘরে, অন্ধকারেই। যেন ঘরটা তার কত পরিচিত!

ঃ কে? ভূতো বললে, ন্যাড়ামামা?—

ঃ ন্যাড়ামামা-টামা আমি নই—আমি ভূত!—ভূত উত্তর দিলো।

অ্যাঁ—করেই তো ভূতোর চোখ একেবারে ছানাবড়া।—

ঃ অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। ভূত হলেও আমি লোক ভালো, কারুর কোনো ক্ষতি করি না। মিথ্যে তুমি ভয় পাচ্ছ। আমি বহুদিন বিলেতে ছিলাম। কাজেই খুব সভ্য ভূত—মাছ খেতে চাই না, ভয় দেখাই না—নাকে নাকে কথা বলতে পছন্দ করি না। বিশেষ অহিংস ভূত। মিথ্যে চেঁচিও না, চেঁচালে আমার ভারি রাগ হয়। ভূত ঘরের আলো জ্বাললো; তারপর ঘরের কোণায় দিদিমার স্টক এক টিন ঝোলা গুড় ছিল, তার ওপরই ছুম্ করে বসে পড়লো।

ভূতো খাটের ওপর উঠে বসলো। বুকের মধ্যে তার যেন একখানা বালির চড়া পড়ে গেছে—শুকনো গলা দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। যতই মাই ডিয়ার লোক হোক—ভূত তো। দাঁত খিঁচোতে কতক্ষণ।

ফ্যাঁচ্ করে ভূতটা একটা হাঁচি দিলো, তারপর রুমালে মুখ মুছে বেশ মানুষের মতো স্বাভাবিক গলায় বললে: বড্ড বর্ষা নেমেছে,

ভূতোর জুতো

তাই একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাব হয়েছে। তারপর পকেট থেকে একটা কৌটো বার করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললে: আঃ! তারপর কিছুক্ষণ ভূতোর মুখের দিকে প্যাট প্যাট করে প্যাঁচার মতো গোল চোখে তাকিয়ে বললে: অমন কোলা ব্যাঙের মতো তাকিয়ে দেখছ কী? গিলবে নাকি আমাকে?

ভূতোর গলার আওয়াজ যেন কেমন স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এলো: ও কৌটোটা তো আমার, ওতে আমার নাম লেখা আছে—

: অঃ!—ভূত বললে আওরঙ্গজেবের মতো সন্দিগ্ধ হাসি হেসে: এ জুতো জোড়া কার, বলতে পারো?

: ওটাই তো আমার নাগরা—ভূতো বলে উঠলো: তবে তুমি চোর ভূত।—বলে ভূতো যেই চেঁচাতে যাবে, অমনি ইঙ্গিতে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভূত বললে, চুপ—চেঁচাবে কি গেছো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ নাগরা জোড়া তো তোমার হ্যাড়ামামার খুবই সখের। পনের দিন আগে এটা সে তোমাদের বাড়ী ফেলে এসেছিল, আর সেটা পরে তুমি কোন্ আক্কেলে বেড়াতে এসেছ, শুনি? ভেবেছ, মামা আই, এ পরীক্ষা দিয়ে শান্তিপুর বেড়াচ্ছে?—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

: তুমি এত কথা জানলে কি করে?—অবাক-বিস্ময়ে ভূতো জিজ্ঞাসা করলো।

ভূত হলে কি হয়—লোকটা রসিক। আর বেশ অমায়িক স্বভাবেরও বটে—মূলোর মতো দাঁত বের করে ভেংচি কাটে না;—অন্য অভদ্র লোভী ভূতদের মতো পথে মাছ চায় না;—পথে মানুষকে মিছিমিছি ভয় দেখাবার জন্যে সড়াৎ করে উঠে পড়ে না। ভূতকে সৎ এবং মোটামুটি ভালো স্বভাবের বলেই ভূতোর মনে হলো। কিন্তু ভূতটা মরার আগে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা ছিল, তা নইলে হ্যাড়ামামার নাগরার কথাটা জানলো কি করে? ওর স্বভাবের দোষেই, যাক্‌গে।

তাও ভাগ্যি হ্যাড়ামামা তার পায়ে এই সাধের নাগরা যদি দেখতো তা হলে পা দুটো তখুনি দাড়ি কাটার মতো কেটে দিতো। তারপরও যদি তার রাগ না কমতো তা হলে পিটিয়ে একেবারে লাউঘণ্ট করে ছাড়তো—

টেবিল থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি তুলে নিয়ে বেশ করে কান খোঁচাতে খোঁচাতে ভূত বললে: কি ব্যাপার, একেবারে যে কাদা বনে গেলে! ভয়টয় দেখাব নাকি? তবে শরীরে আমার রাগ নেই, তাই এতক্ষণ চটিনি।—তোমাকে আমি বলে রাখি—পরের জুতো পরা আমি মোটেই পছন্দ করি না, তার ওপর—মামা-টামার জুতো।

: ওটা তো হ্যাড়ামামা ফেলে এসেছিল—আর আমি ওটা ঠিকই বিনিমাসীকে দিয়ে দিতাম—ভূতো বললো।

: দেখ, বেশী গুল মেরো না। সবার মনের কথাই আমরা জানি। যদি মিথ্যে বলো তবে অন্য রাগী ভূতকে ডাকবো এখুনি। সবাই আমার মতো ভালো ভূত নয়। তারপর তারা এসে যদি ভয়টয় দেখায় তখন বাপু আমাকে দোষ দিতে পারবে না—তা আগেই বলে রাখলাম। এই না বলে ফ্যাঁচ্-চো করে একটা কালী পুজোর পটকার মতো আওয়াজ করে যেই উঠতে যাবে—অমনি ভূতো তাক্ বুঝে—"ওরে বাবারে—বিনিমাসীরে" বলেই চিৎকার।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো গেল ফুস্ করে নিভে এবং ভূতটা ঠিক মানুষের মতই ভয় পেয়ে দিলে এক ভীষণ পঁচিশ-গজী লাফ! আর ভূত হলে কি হবে—এটা একটা স্নুটকো ভূত, কাজেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে দিদিমার বর্ষার সঞ্চিত ঝোলা গুড়ের টিনের ওপর গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় শব্দ করে একেবারে ভূত কুপোকাৎ। যত রাজ্যের গুড় আর পিঁপড়ের মধ্যে মুড়কির মতো মাখামাখি হয়ে গিয়ে কেমন বোকা বনে গেল! তারপর ব্লাডারের মতো চুপসে যাওয়া গলায় বললে: ওরে ভূতো, আমার নাকে রাজ্যের

পোকা আর পিঁপড়ে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে—শীগ্‌গির আলোটা জ্বালতো।

এ-কি! এ-যে নির্ভুল হ্যাড়ামামার গলা।

ঘরের বাইরে একেবারে যেন মেছোবাজার লাগিয়েছে—বিনিমাসী আর দাদু: ওরে কি হলো, ও ভূতো, চোর নাকি—দরজা খোল—বমি করছিস নাকি?—কী আপদ! দরজা তো খোলে না, অসুখ হলো নাকি?

: ভূত গুড়ের টিন উল্টে দিয়েছে—বিনিমাসী, চিৎকার করে বললে ভূতো—

: কি বললি, ঘুরে পড়ে গেছিস—ওরে ও দারোয়ান, ও—ছুছুন্দর সিং—সব গেল কোথায়!—কী বললি—ভূত?—বলিস কী?

লাঠি হাতে ছুটে আসা ভোজপুরী দারোয়ানটা 'সিয়া-রাম সিয়া-রাম' বলেই লাঠি ফেলে দৌড়!

দাদু মাটিতে পড়া লাঠিটা তুলে নিয়ে নিজেই দরজায় ধাক্কা দিয়ে বিনিমাসীকে বললেন—ভাঙ্ দরজা—ছেলেটার কি হলো দেখতে হবে না? দারোয়ান হতভাগা কেবল বস্তা বস্তা কাঁঠাল খাচ্ছে আর হিংএর কচুরী।—ধরে আন্ তো অকর্মার কাঁঠালকে, ওর মাথাতেই আগে আমি লাঠিটা ভাঙবো!—পাশে দাঁড়ানো চাকরটাকে হুকুম দিলেন।

: দাদু আমি উঠতে পারছি না—ভূতো আবার হাঁক দিলো।

এবার দরজায় লাঠির ঘা পড়লো—দুম—দুম—

ভূতটা হুড়মুড় করে উঠতে চেষ্টা করেই, আর্তনাদ করে উঠলো—এবার দু'নম্বর ড্যামেজ—কুঁজোটা ভাঙলো, সারা ঘর জলে থৈ-থৈ করছে একেবারে!

: ভূতো ও নাগরা আর আমি চাই না—তুই নে।—আমায় একটু ধর—আমি বাথরুমের মধ্যে লুকোই। বাবা তো আমাকে আস্ত

রাখবে না—ঠিক গ্যাড়ামামার মতো তোতলানো গলায় ভূত মিনতি করলে।

ভূতো আশ্চর্য হয়ে বললে : তাহলে তুমি ভূত নও সত্যি করে, গ্যাড়ামামা—

: হ্যাঁ রে হ্যাঁ ; নিমতলায় থাকি বলেই কি ভূত হয়ে গেছি। আর্ত-স্বরে গ্যাড়ামামার গলা দিয়ে কথাটা বেরুতে না বেরুতে একেবারে হুড়মুড়করে দরজা ভেঙে প্রবল স্রোতের মতো বাইরের সবাই ঘরে ঢুকে পড়লো। বিনিমাসীর খুব সাহস। টুপ করে আলোটা জ্বালাতেই দাদু বললেন : ভূত কো ঝুঁটি পাকড়ো, ব্যাটা ছিঁচকে চোর হ্যায়—

: ভু-র-র—একটা রাম ছাগলের মতো আওয়াজ। দেওয়াল ধরে দাঁড়ানো গ্যাড়ার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু এবার আলোতে ভূতো দেখলো একটা বিকট মুখ। গায়ে কালো কম্বল আর গুড়ে সর্বাঙ্গ বিবর্ণ। সত্যিই কি এ গ্যাড়ামামা? ভূতো যেন কেমন চমকে গেল। ছুছুন্দর শিং কিন্তু একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। বিনিমাসীও নীরব।

: বাত বলো, কোন হ্যায়—দাদুর গলা এবার যেন কেমন কেঁপে গেল : ঘণ্টা সিং, চোরকে মুখে আলো ধরো!

গুড়ের টিনের মধ্যে থেকে একটা আরশোলা এই অবকাশে গুটি গুটি হেঁটে এসে দাদুর পায়ে, বোধহয় অকারণ গুড়ে পড়বার জন্যে প্রণাম করে ক্ষমা চাইছিল কিন্তু দাদু তো তা বোঝেন নি! একে তিনি সামনে দাঁড়ানো ভূত দেখে বেশ ভয় পেয়েছেন তারপর এই ব্যাপার আর কত সহ্য হয়!—ওরে বাপ বলে একলাফ দিতেই গুড়ের ওপরে পিছলে গেলেন, আর পায়ের থেকে খড়ম ছুটে গিয়ে একেবারে ঘণ্টা সিং-এর কপালে!

: ওরে বাপ, জিন—বলেই ঘণ্টা সিং তিন লাফে একেবারে উধ্বর্শ্বাসে ছুটতে লাগলো। আর দাদু তো অজ্ঞান!

: বাবা আমি হ্যাড়া, মুখে একটা মুখোস—হ্যাড়া কেঁদে বললে।

: দাদু, ও তো হ্যাড়ামামা।

দাদুর মাথায় জল দেবার পর যখন জ্ঞান হলো, তিনি বললেন : পিঠের ফোঁড়াটা এক আছাড়েই ফেটে গেছে। যাক, যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচা গেল, নইলে কালই তো অপারেশন করতে হতো। আয়, নিয়ে আয় তো ওই হতভাগাকে, ওর নাকটা কেটে দি। ভূতো নাগরা জোড়া আন, ওর গলায় ঝুলিয়ে দেব।

ভানুমতীর খেল

হাটের মধ্যে চিৎকার করতে লাগলো টেপা: আশ্চর্য—অত্যাশ্চর্য—। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! দেখুন—শুনুন—বুঝুন। বাঁদর আপনাদের ভাগ্য বলে দেবে।

একটা মাঠের ভেতর হাট বসেছে। সেই হাটের এক কোণায় একটা মস্ত বড় বটগাছ আর তারই তলায় বসে চিৎকার করে কাঁসর বাজিয়ে—চোঙা ফুঁকে টেপা লোক ডাকতে লাগলো আর তারই একটু দূরে একটা হাতল ভাঙা চেয়ারের ওপর চালকুমড়োর মতো উদাস উদাস ভঙ্গিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন কুট্রিপিসি।

কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে বন্যার মতো। তাদের সার্কাসে মন নেই—; ভালুক নাচ দেখবে না, এমন কি তেলে ভাজা পর্যন্ত খাবে না। তারা হন্যে হয়ে ছুটেছে বাঁদরের খাঁচার দিকে।

একটা বেশ মনোরম খাঁচা—তার চারপাশ তাঁবুতে ঢাকা। তাঁবুর চারদিকে শুধু বাঁদরের ছবি। তার সামনে বসে আছেন চেয়ারে স্বয়ং কুট্রিপিসি, আর ঘোষক টেপা চিৎকার করে ঘোষণা করছে—যা জীবনে কখনও দেখেন নি—তাই দেখে জীবন সার্থক করুন। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না—।

একদল লোক ভীড় করে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে যেই ঢুকতে যাবে অমনি কুট্রিপিসি রেগে মেগে একেবারে হিন্দী করে বললো: পাঁচসিকা নিকালো—এই আদমী—থতমত খেয়ে লোকটা পাঁচসিকে কুট্রিপিসির হাতে গুঁজে দিলো।

কুট্রিপিসি বললে: এক মিনিট—বলেই একটা কালো পরদা

সামনে টেনে দিলেন। তারপর ভেতরে ঢুকে বললেন : আসুন—আসুন।

এক সঙ্গে সাতজন লোক ঢুকে পড়লো।

একটা প্রায়ান্ধকার জায়গায় একটা বড় খাঁচা রাখা আছে আর তারই পাশে বসে আছে বেগুন-বেচা মুখ করে একটা বাঁদর আর তার পাশে বসে আছে পাঁপড় ভাজার মতো মুখ করে কুাট্রিপিসি। চোখ মুখ যেমন কট্‌কটে তেমনি কড়মড়ে।

: প্রশ্ন করুন—যা বলবেন, সেই কথারই উত্তর দেবে। একে যা তা বাঁদর ভাববেন না। এর পেডিগ্রি অর্থাৎ বংশ তালিকা যদি শোনেন, চমকে যাবেন। ওর দাদুর জ্যাঠামশাইয়ের পিসশ্বশুরের ঠাকুর্দার আদি পুরুষ রামের সঙ্গে পুল বানানোর কাজে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। ওর কাকার পিসিমা সার্কাসে রামছাগলের পিঠে চড়তো, এখন সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হরিদ্বারে নাম কীর্তন করে। ওরই ছোট মামার পিসতুতো ভাইয়ের মেজকাকার কে-যেন-কে রামকে বুক চিরে-টিরে যেন কি দেখিয়ে চমকে দিয়েছিল—। এ তারই বংশধর। সব রকম ভাষা জানে—যা খুশী জিজ্ঞাসা করতে পারেন। যে কোন ভাষায় উত্তর চান, পাবেন।

আচ্ছা বলতো : আমার মেয়ের কবে চুল গজাবে?

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বানর বললে : চুল গজাবে কী করে? তার কী উপায় রেখেছেন?

বাঁদরে আবার কথা বলে! যে প্রশ্ন করেছিল, সে তো হাঁ করে রইল। মাথা চুলকে বললে : ঠিক, ওর মাথায় খুব উকুন ছিল।

—উঃ, কী আশ্চর্য---

: আমার বুঁচির নাকে কী হয়েছে বলতো?---আর একজনের জিজ্ঞাসা।

: নাকটা ওর খাঁদা!

: কি আশ্চর্য—কি আশ্চর্য ! এবার পটাপট হাততালি পড়লো। —আর কুট্টিপিসি একটু একটু ঢুলতে লাগলেন।—মুখ তাঁর গম্ভীর।

আর একটি লোক এসে জিজ্ঞেস করলো : তুমি কি কি ভাষা জানো, বলতো ?

সব রকম ! বাঁদর উত্তর দিলো—।

সব রকম ?—বাবা ! একজন বাঁদরকে জব্দ করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলো : আচ্ছা চীনে ভাষায় বলো তো "মুরগী কিনবো"।

: পু ইয়াও চি।—

আবার হাততালি পড়লো—। আরো বলো, আরো বলো।

: পু ইয়াও চি—।

—বললাম তো, মুরগী কিনবো।

: চটাপট হাততালি পড়লো—

রাশিয়ার ভাষা জানো ? বলোতো ?

: খরসো—অচিন খরসো—

আবার হাততালি পড়লো—

: ফরাসী জানো ?—

ফ্যারসি যিনি ! আর দেখতে হলো না। চারিদিক থেকে অসংখ্য পয়সা এসে পড়তে লাগলো। আর এত ভীড় জমলো, এত যে লাইন পড়ে গেল, টেপার আর কুট্টিপিসির সাধ্য কী যে, এ ভীড় সামলায়। শেষ পর্যন্ত ভীড় সামলাবার জন্যে পুলিশ ডাকতে হলো। পুলিশ দুবার লাঠি চার্জ করে আর একবার টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে সবাইকে চোখের জলে বিদায় দিলো।

শো শেষ হয়েছে। পয়সা কুড়িয়ে আর শেষ করতে পারছে না কেউ। কত একটাকার নোট, কত আধুলি, কত সিকি একেবারে রাতা-রাতি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো হাজার হাজার টাকা এনে দিলে। কিন্তু ব্যাপার কী ? বাঁদর কথা বলে ? এ কী সম্ভব হয় ?

দেখেশুনে টেপার মনের ভেতর তোলপাড় চলতে লাগল।

রাত যখন গভীর হয়েছে তখন টেপা বললে: কুট্টিপিসি ব্যাপার কি বলো তো? নিশ্চয়ই তুমি ভেল্কি জানো, নইলে—ওই তো পড়ে আছে মরা খেকো বাঁদরটা, সে এত কথা বলতে পারলো কী করে?

: তবে শোন, কুট্টিপিসি বললেন: সে অনেক কথা, বাইরে দেখ্ তো কেউ আছে নাকি? একটু কাছে আয়, শোন তবে—

কুট্টিপিসি বলতে লাগলেন, সেবার তীর্থে যাব ঠিক করলাম, কিন্তু হাতে টাকা নেই। কত লোকের কাছে গেলাম। কেউ-ই দিলে না। তোর কাকারা তো বড়লোক, তাদের বাড়ী গেলাম—; প্রথমে সে বেশ গল্প সল্প করলে, কিন্তু যখন টাকা ধার চাইলাম তখন কাছ থেকে উঠে গেল, আর বললে: 'আর আপনি আসবেন না।' মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম আর বড়লোকের বাড়ী যাব না, তার চেয়ে মায়ের দরজায় ফল বেচবো। এই মনে করে কতকগুলো কলা, কমলালেবু, শাঁকআলু, বাতাসা আর কিছু সস্তার জামা কাপড় নিয়ে বেচবো বলে গেলাম। একটা কোণার দিকে গাছের তলায় বসে বসে ভাবতে লাগলাম: কি আমার অদৃষ্ট! আমার মতো হতভাগী আর কে আছে।

মাথার ওপর খাড়া রোদ্দুর—তার ওপর খাওয়া-দাওয়া নেই—হঠাৎ গলাটা যেন ভারি শুকিয়ে গেল—একটু জল খাব বলে গঙ্গার ধারে গিয়ে আঁজল আঁজল জল তুলে খেয়ে শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হলো। ধীরে ধীরে দোকানের কাছে আসছি—হঠাৎ চিঁ—চিঁ—খক-খক, কিচ-কিচ শব্দে আমার কান যেন কালা হয়ে যেতে লাগলো; দেখি, আমারই দোকানে বসে একদল বাঁদর কলা খাচ্ছে—ভেংচি কাটছে—আমার গায়ের রক্ত জল করা পয়সার টুপি-গেঞ্জি গায়ে দিচ্ছে—ছিঁড়ছে—ফেলছে। একেবারে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে। দেখে

তো আমার চক্ষু স্থির। কি সর্বনাশ—আমার সর্বস্ব এরা নষ্ট করে দিলো? আমি রাগে দুঃখে কেঁদে ফেললাম। তাই দেখে বাঁদরগুলো আমায় ভেংচি কাটলো—তারপর খক খক করে একটা গোদা বাঁদর আমার দিকে তেড়ে এলো।

আমার আর সহ্য হলো না। একটা পড়ে থাকা লাঠি হাতে তুলে নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে দিলাম একটা বাঁদরকে লক্ষ্য করে, আর সেটা লাগবি তো লাগ গিয়ে ধম করে একটা বাচ্ছা বাঁদরের গায়ে গিয়ে পড়লো। আর যায় কোথায়, যত বাঁদর ছিল, সব বাঁদরামি সুরু করে দিলো। চিঁ-চিঁ শব্দ করে একেবারে ছুটে এলো। এবার একটা ইট দিলাম তাক করে ছুঁড়ে—খ্যাঁক করে একটা আওয়াজ হলো, বুঝলাম, একটা শত্রু ঘায়েল হয়েছে। আর বাকী যারা ছিল—তারা খক খক করে খানিকটা চেঁচিয়ে শেষে রণে ভঙ্গ দিলো। আমি খানিকটা লুকিয়ে রইলাম।

: বাচ্ছা বাঁদরটার কী হলো—ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো টেপা।

: থাম, ব্যস্ত হোস না। শোন—আমি তো আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম, দেখলাম সত্যিই একটা বাচ্ছা বাঁদর পড়ে আছে। আর দেখে মনে হলো, মরার মতো পড়ে আছে। আমি ধীরে ধীরে গিয়ে ওকে উঠিয়ে নিলাম—হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি দিব্যি জটা জুটো ধারী এক সাধু-বাবা। সে বললে: মা, ওকে ঘরে নিয়ে যা, ওই বাঁদর থেকেই তোর কপাল ফিরে যাবে।

আমি বললাম: কি করে?—কি করে সাধু-বাবা?

এই নে, মাদুলী—এর জোরেই তোর সব হবে। এত টাকা হবে যে বাক্সে ভরে কূল কিনারা পাবি না—

: জয়-মা-কালী, বলে আমি যেই প্রণাম করলাম মাটিতে মাথা রেখে, আর মাথা তুলে দেখি কেউ নেই। কত খুঁজলাম সাধু-বাবাকে তন্ন তন্ন করে। কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম। তিন-চারদিন

ওখানেই রইলাম, কেউ কোন খবর দিতে পারল না। তখন অগত্যা বাঁদর নিয়ে বাড়ী এলাম।

বাঁদরটা ভারি শান্ত, খায় শুধ্ শটির পালো আর ভাতের মাড়। একটু ধর্মপ্রাণ বলেই মনে হলো।

: কিন্তু—

: থাম, শোন, বলেই কুট্টিপিসি ওকে একটা রাম-তাড়া দিলো। ধৈর্য ধরে যদি গল্প শুনতে না পারিস, বে আসিস কেন জ্বালাতে।

: বলো, চটো কেন! টেপা কুট্টিপিসিকে বোঝাতে চাইলো।—

একবার সারাদিন একাদশী করে শুয়ে আছি—। হঠাৎ ভোররাতে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন কাছে এসে বললে: কুট্টিপিসি—ও কুট্টিপিসি। চমকে তাকালাম—দেখি সেই সাধু। বললেন সাধু-বাবা, আমার আশীর্বাদে তুই সব করতে পারবি। বলেই মুখের লম্বা লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন আর গোল গোল চোখ দুটি দিয়ে ফুলঝুরির মতো আলো বার করতে লাগলেন। তারপর দেখি, আঁচলের খুঁট খুলে কী যেন কুট-কুট করে খেতে লাগলেন আর একটু হাসি হাসি মুখ করে বললেন: হ্যাঁ—তোর সময় হয়েছে। তুই ওই বাঁদরটাকে নিয়ে নিমতলার হাটে যা—সেখানে তোর আসল ভাগ্য পরীক্ষা হবে। সঙ্গে বাঁদরটাকে নিবি—'এই তোর মাথায় ফুস-মন্ত্র দিলাম', বলেই সাধু-বাবা আমার মাথায় ফুঁ দিলেন এবং তিনবার হেঁচেই অদৃশ্য হলেন।

মেলার সকলকে বাঁদরের কথা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছি।

: বাঁদর কথা বললো কী করে তাতো বললে না? টেপার এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

কুট্টিপিসি মৃদু হাসতে লাগলেন—তারপর বললেন, কই—কই ফুস-মন্ত্রের জোরে আর সাধুবাবার আশীর্বাদে আমি 'হরবোলা' হয়ে গেলাম। বাঁদর কি কথা বলেছে নাকি? সব তো আমি বলেছি।

হরবোলারা জানিস তো সব রকম শব্দ করতে পারে, কথা বলতে পারে, আওয়াজ করতে পারে—পাখির ডাক ডাকতে পারে—গাধার ডাক ডাকতে পারে—আমিও তেমনি সব রকম ডাক ডাকতে পারি।

: আর নানা ভাষায় কথা—? ওতো ক'দিন ধরে কেবল পাখী-পড়া করে মুখস্থ করেছি। আর কী কিছু জানি, ওই ক'টা কথাই জানি। বলেই কুট্টিপিসি ঘ্যাঁক করে এমন এক বাঘের মতো গর্জন করলেন যে, টেপা একেবারে 'ওরে বাবা' করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, তখন সে এক কেলেঙ্কারী—কুট্টিপিসিকেই তার দাঁত ছাড়াতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল—।—বাঁদর সে কী করে অদৃষ্ট ফেরালো—এবার তো বুঝলে ?

টাক মানে টাকা

খ্যাংরাপট্টি দিয়ে বেশ অন্যমনস্ক হয়েই চলছিলাম। হঠাৎ কানে এলো মার-মার—

নির্ঘাৎ পকেটমার—পকেট কেটে পালাচ্ছে, সুতরাং একটা গলির মোড়ে বেশ অন্ধকার দেখে একটা ভাঙা মোটর গ্যারেজে আত্মগোপন করে রইলাম। পকেটমার বাছাধন এই পথে এলেই ক্যাঁক করে ধরে ফেলবো। হলোও তাই। পেছনে ভীষণ চিৎকার করে জনতা ছুটছে—আর আগে আগে রেসের ঘোড়ার মতো একটা লোক ছুটে আসছে—আর যায় কোথায়—একেবারে—ক্যাচ্—কট—কট যাকে বলে। ঠিক ধরে ফেলেছি।

লোকটা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ কাতর হয়ে লক্ষ্য করলে, তারপর বললে : কেষ্টা, বাঁচা ভাই।

: পঞ্চুদা—?

: চুপ। ওরা এসে গেল বলে। বলেই একটা ভাঙা মোটরের তলায় আমরা লুকিয়ে বসে পড়লাম। আর পঞ্চুদার সে কি কাঁপুনি, যেন একশো পঁচিশ ডিগ্রি জ্বর হয়েছে।

পঞ্চুদার ওপর বোধহয় ভগবানের ততটা রাগ ছিল না, তাই সে এ-যাত্রা বেঁচে গেল। লোকগুলো ঝোঁকের মাথায় চেঁচাতে চেঁচাতে ঐ গলির মোড় পার হয়েছে, আমরা অমনি উল্টো দিক দিয়ে এক ছুটে একেবারে বড়দার মেসে গিয়ে ঢুকলাম। জানি, এ-সময় সে অফিসে, কিন্তু আর একটা চাবি আমার কাছেই থাকে। কাজেই আমরা আপাততঃ ওখানে আশ্রয় পেলাম।

ঘরের আলো জ্বালতেই আমরা চমকে উঠলাম।—পঞ্চুদা ডুকরে কেঁদে উঠলো আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। পঞ্চুদার মাথা কামানো, তাতে গোবর এবং চিটেগুড়ের প্রলেপ। সারা পিঠে মারের দাগ—জামা ছেঁড়া—মুখে চুন ও কালির চিত্র-বিচিত্র—

আমি বললাম : এ কি ধরনের ডেকরেশন ?

: আর বলিস্‌নে কেষ্টা, আগে এক কাপ গরম চা আন, তারপর সমস্ত বলছি !

চা এলো এবং খাওয়া হলো। এবার একটু সুস্থ হয়ে পঞ্চুদা শুরু করলো—

: তুই তো জানিস্ বরাবরই আমার স্বপ্ন দেখার একটা 'ন্যাক' আছে, আর স্বপ্ন দেখে নানা রকম কষ্টও পেয়েছি। কিন্তু আমার সরল মন, তাই স্বপ্ন দেখে তা অবিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুদিন হলো পথে-ঘাটে খুবই টেকো লোক দেখছি। কারো টাকে রোদ পড়ে ঝিলমিল খেলছে ; কেউ বা নিজের টাকে মাতোয়ারা হয়ে হাত বুলোচ্ছে ; আমার মায়ার শরীর। এসব কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে ঘুমিয়েছি অমনি এক স্বপ্ন।

"আমি টাকেশ্বর বাবা, তোকে টাকের ওষুধ দিয়ে গেলাম। তুই পরোপকারে আত্মনিয়োগ কর। বড়ো টাক, মেজ টাক, ছোট টাক সব টাকের ওপরে একেবারে টাকডুমাডুম বাদ্যি বাজাবে। মানে ঘন ঘাসের মতো চুল গজাবে। কিন্তু তুই যেমন সরল লোক, কাউকে বিনে টাকায় যেন দিসনে—নগদ পাঁচসিকে নিয়ে দিবি"—বলেই টাকেশ্বর বাবা কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

আমি খ্যাংরাপট্টিতে একটা ছোট মতো দোকান ভাড়া নিলাম। টাকেশ্বর বাবার দেওয়া ওষুধ ছোট ছোট কৌটোয় ভরলাম এবং বাইরে সাইনবোর্ড টাঙালাম : "স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ—টাক থাকলে ঘন ঘাসের মতো চুল গজাবে—; টাক পড়ার চিন্তায় যাদের মাথা গরম

হচ্ছে তাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে। টাকেশ্বর বাবার মাদুলী পাঁচ আনা; বংশগত টাকের জন্য অব্যর্থ; আর সাধারণ টাকের জন্য পাঁচ সিকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়!"

দেখতে দেখতে দোকানে ভিড় লেগে গেল। কিন্তু আমি সবার



নাম-ঠিকানা না জেনে বিক্রি করতাম না। শনিবার দিন যখন দূরের গাড়িতে লোকে যেত মফঃস্বলে, আমি তাদেরই ওষুধ বেশী দিতাম। কি বলবো তোকে, শেষটা এক মাসের মধ্যে আমি একটা ঠ্যালাগাড়ী, একটা বালতি আর একটা খাট কিনে ফেললাম।—এবার টাকেশ্বর বাবার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই বড়লোক হবো এটা বুঝতে আর আমার একটুও দেরী হলো না। বেশ কাটছিল। ভাবলাম, টাক মানে টাকা। দুনিয়ায় এত টাক আছে বলেই তো আমার এত টাকা

হচ্ছে। 'জয় হোক বাবা টাকেশ্বরের' যেই না বলেছি এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছি, অমনি একটি গাড়ী এসে দাঁড়ালো দরজায় এবং তার থেকে তিনটি লোক নামলো ! একটির মাথা-জোড়া গড়ের মাঠের মতো টাক—তাকে ব্যালান্স করেছে একটি নিটোল নেয়াপাতি ভুঁড়ি ; আর একটি ঝড়ের মাথা-ভাঙা তাল গাছের মতো—; ছ' ফুট তিন ইঞ্চি



আগেকার মাপে—; আর তার মাথা-ভরা চক্‌চকে দার্জিলিং-এর গ্লাস-হাউসের মতো টাক। আর একটি কালো, বেঁটে এবং মোটা চেহারা, অনেকটা কুট্টিপিসির পেতলের বালতির মতো ; তার মাথায় টাক—

কিন্তু মরুভূমির মরুদ্যানের মতো কোথাও কোথাও এক এক থোপা চুল, তখনও দক্ষিণা বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে।

: তারপর? আমি বললাম।

: নামলেন তাঁরা, মানে অবতীর্ণ হলেন বলা যায়। তাঁরা তিনজনই থ্রি মাসকেটিয়াসে'র মতো—হেলে-দুলে বীরদর্পে আমার তিনটাকা দামের তক্তপোশটার ওপরে এসে বসলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই কাটা কুমড়োর মতো ঝপাৎ করে খাট ভেঙে আমার পাঁচনের কড়াই-এর মধ্যে ঝপাৎ করে পড়ে গেল।

: ভাঙ্‌লো তো?—বলেই তাদের কিছু বলতে দেবার আগেই নিজেই ভীষণ চেঁচাতে লাগলাম: গরীব মানুষের একখানা তক্তপোশ—তাও দিলেন ভেঙে, কেমন ভদ্রলোক আপনারা? আমি আপনাদের উপকার করি, তারই কি এই প্রত্যুপকার?

যে লোকটা একটু খাটো আর মোটা সে আমার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললে—ভাঙা খাটের বদলে নতুন খাট পেলে—কিন্তু টাকের কি ব্যবস্থা হবে?

দেখলাম, লোকগুলো পড়ে যাবার ব্যাপারটা মোটেই গ্রাহ্য করলো না। ওদের টাকের চিন্তাই এখন বেশী। ওদের যে টাকা আছে আমি আগেই বুঝেছিলাম তাই বললাম: ব্যবস্থা একটা হবে, কিন্তু তার আগে জানতে চাই আপনারা টাকা কিভাবে খরচ করতে পারবেন এবং টাকের বাবদ কত টাকা ব্যয় করতে ইচ্ছুক। তিনজনই সমস্বরে বললে: সর্বস্ব, কারণ আমাদের দাদু অত্যন্ত টাক-বিরোধী। তাঁর বিপুল সম্পত্তি—কিন্তু টাক যার থাকবে তার কপালে সব ফাঁক অর্থাৎ শূন্য। এদিকে আমাদের তিনজনার মাথাতেই টাক—কাজেই কী করে টাক থেকে মুক্তি পাব আমরা, তার একটা ব্যবস্থা করুন। যা টাকা খরচ হয় তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

: আপনাদের অসুখটা বড্ড জটিল—এবং আমাকে যখন সারাতেই

হবে তখন আমাকে একটা দিন সময় দিন। আমি টাকেশ্বর বাবার একটা পূজো আগে দিয়ে নিই।

: বেশ, তাই হবে। আমরা কাল আসবো।

আমি হাত পেতে বললাম: প্রণামী তিন-পাঁচে পনের টাকা। ঝন ঝন করে পনের টাকার মুদ্রা আমার হাতের ওপর পড়লো।

পরদিন যথা সময়ে আবার তিন টেকোর আবির্ভাব। আমি আমার বোতল থেকে খানিকটা জল ওদের মাথায় ছিটিয়ে বললাম: এই মাদুলী নিন। হাতে পরুন। তিন মাস নিরিমীষ খেতে হবে। মুরগী-টুরগীর দিকে চাইবেন না। চাইলেই চোখ অপবিত্র হয়ে যাবে। খুব সকালে মাথায় গোবর মেখে বাবা টাকেশ্বরের ধ্যান করবেন, আর রোজ একটা করে পাকা কাঁঠাল খাবেন। একমাস পরে দেখবেন মাথায় ঘন দুর্বো ঘাসের মতো চুল গজিয়ে গেছে—কেটে শেষ করতে পারছেন না।

শুনেই পায়ের কাছে একেবারে একখানা একশো টাকার নোট উড়ে পড়লো ; আমি সেটার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললাম: জয় বাবা টাকেশ্বর, মান রাখিস আমার। বলেই পঞ্চুদা একটুখানি থামলেন। হাপরের মতো মার খেয়ে ঝাঁজরা বুকটা দিয়ে কেমন ফস্ ফস্ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। তারপর বললেন, খবরটা আমাকে ওখানকার এক ভদ্রলোক যোগাচ্ছিল। তার সঙ্গে আমার চোদ্দ আনা দু' আনার ভাগ। কথা ছিল পালাবার সময় হলে সে আমায় জানাবে, আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম।

শুনলাম, ওরা নাকি খুব মন দিয়ে মাথায় গোবর মাখছে আর গঙ্গায় স্নান করছে। মনে মনে বললাম: কর বাবা, তাই কর, কিন্তু আমার ওপর আর যেন চড়াও হয়ো না।

ঃ দ্বিতীয় বার খবর পেলাম ; ওরা তিনজনে চোখে কাপড় বেঁধে বেড়াচ্ছে, পাছে মুরগী-টুরগী দেখে ফেলে আর ওদের খাবার ইচ্ছে হয়।

তারপর চুপচাপ কিছুদিন কোন খবর নেই। আমিও বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। মনে করেছিলাম, আপদ বুঝি বিদায় হলো।

কিন্তু একদিন হঠাৎ খবর পেলাম তিনজন লোকের মাথাভরা ঘা, তারা চোখ বেঁধে গঙ্গায় নাইতে যাচ্ছিল, তিনজনেই একত্রে একটা প্রকাণ্ড গাড়ীর তলায় পড়েছে। কিন্তু তারা বিশেষ আহত হতে পারেনি, কারণ তাদের দেহ এত বিরাট এবং মাথার টাক এমনই মসৃণ যে গাড়ীর চাকা পিছলে গেছে এবং একটা ল্যাম্পপোষ্টে লেগে যেমন ছিল, পড়তে পড়তে—কাত হতে হতে তেমনি দাঁড়িয়ে গেছে।

খবর ভালো নয়। আজ হয়তো বাঁচালো। কাল হয়তো চাপা পড়তে পারে, কাজেই এটা বোধহয় একটা সতর্ক-বাণী। আমি মনে মনে চিন্তিত হলাম।

ওদিকে একদিন সেই ভদ্রলোক এসে খবর দিলো, আমার রুগীদের মন নাকি ভীষণ খারাপ। ওদের মাথায় যদি বা চুল গজাবার কিছু সম্ভাবনা ছিল এবং আমার মনে একটু আশাও যা ছিল, এখন দেখছি কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ যে পরিমাণ কাঁঠাল খাচ্ছে, তাতে ওরা স্বর্গীয় না হয়!

এদিকে কাঁঠাল খেতে খেতে ওদের এমন অবস্থা যে সারা গায়ে কাঁঠালের গন্ধ। একদিন খুব গরম পড়েছে, ওরা তিনজনে একটা গাছের তলায় শুয়ে আছে। এই অবসরে একটা গরু মাঠ থেকে তার তিনটে বন্ধু নিয়ে ফিরছিল। তারা একটা মনোমুগ্ধকর গন্ধ পেতেই ছুটে গিয়ে একেবারে বীর বিক্রমে চাটতে লাগলো আর চাটতে চাটতে মাথার টাককে একেবারে চকচকে করে দিলো। গলার মাদুলী খেলো, হাতের তাবিজ খেলো, তারপর যেই চোখের কাপড় খেয়েছে অমনি ওরা তিনজন উঠে বসেছে তিড়িং করে। এতক্ষণ ওরা তিনজনই স্বপ্ন

দেখছিল, বাবা টাকেশ্বর ওদের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় হাত বোলাচ্ছেন : সু-মন্তরে মাথা-ভরা সর্ষে ক্ষেতের মতো চুল হোক—

উঠেই গরু দেখে তো হতভম্ব। তারপর তিনজন ছুটতে লাগলো আর কাঁঠালের গন্ধে বিব্রত গরুর দলও ছুটলো পেছনে পেছনে। শেষ



পর্যন্ত তিনজনে একটা মুড়িওলার দোকানে ঢুকে প্রাণ বাঁচায়—এবং তারপর একেবারে সব ক্ষেপে গেল।

যাবেই আমি জানতাম। কিন্তু সেই লোকটা আমাকে কোন খবরই দিলে না। আমি ভাবছিলাম পরদিনই ঘরটা ছেড়ে চলে যাবো। কারণ এ-ক্ষেত্রে পালানোই ভালো, কখন কোন্ বিপদ হয় কে জানে। তাই যাবার আগে একদিন একটু মাংস আর পোলাও খেয়ে চিরদিনের মতো ব্যবসা উঠিয়ে চলে যাবো।

মাংসের হাঁড়ি নামিয়ে যেই পোলাওটা চাপিয়েছি—অমনি যেন মনে হলো চারিদিকে ভীষণ গোলমাল সুরু হয়েছে। মনে করলাম, পাশের বাড়ীর ছাদে দুই বুড়ো দাবা খেলে, তারাই ঝগড়া করছে।

গোলমাল আরো বাড়তে লাগলো।

এদিকে পোলাও ফুটছে—তোকে কী বলবো তার কী গন্ধ! প্রাণ যেন মাতোয়ারা করে দিচ্ছে। আমি যে এত ভালো রাঁধতে পারবো এ কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। চিৎকার করে গান করতে ইচ্ছে করলো: 'ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা, হৃদয়ে মাগিয়া লব।'

গান গাইতে গাইতে নিজের ওপর ভারী ভক্তি হলো আমার। মনে হলো, গানের গলাও আমার অত্যন্ত ভালো; তবে কিনা—একটা বেড়াল এসে গুটি গুটি মাংসের হাঁড়ি শুঁকছে। তাকে একটা ছোট মতো কিল দিয়ে একটু মাংস চেখে দেখলাম: অপূর্ব—; অবদান যাকে বলে বাংলায়, কিন্তু ওতে নুন দেওয়া হয়নি। যাক্‌গে, খাবার সময় মেখে খাব।

ঠিক এমনি সময় আমার চারিদিকে যেন ঝড় ভেঙে পড়লো। চিৎকার, মার-ধোর—হাঙ্গামা।

আমি ছুটতে লাগলাম। প্রাণপণেই ছুটতে লাগলাম ডগলাসের মতো, কিন্তু মার খেয়ে তখন আমি প্রায় মরার মতো।

তারপরের খবর তো জানিস্‌ই। পঞ্চুদা চুপ করলেন।

: আর বেরিও না পঞ্চুদা—ওরা যদি আবার ধরে ফেলে!

: যে গোঁ ওদের, তাতে যে সহজে ছাড়বে তা বলে তো বোধ হচ্ছে না। তায় ক্ষেপে গেছে! তবে তুমি পঞ্চুদা—ছদ্মবেশ ধারণ কর, নইলে আর উপায় নেই—। দাড়ী আর পরচুলা লাগাও—

পঞ্চুদা ডুকরে কেঁদে উঠলো: ওরে ভাই দাড়ি আর পরচুলার কথা বলিস্‌নি—ওতে আমার হার্টে বড়ো আঘাত লাগে! ওই তো আমার—এত কষ্টের হেতু। বাবা টাকেশ্বরের কৃপায় ভাবতাম টাক মানেই টাকা—এখন উঃ—টাক দেখলেই মনে হয় সব ফাঁকা।—বিলকুল মহাশূন্য!

কুট্টিপিসির হাসপাতাল

কেষ্টা বললে : আমার শ্যামনগরের পিসিমার নাম শুনেছিস ?— বলেই একটা ভয়ানক রকমের উচ্চাঙ্গের ভঙ্গি করে বসে রইলো।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : না শুনি নি, তবে শুনতে কতক্ষণ !— বলেই খুব সপ্রতিভভাবে কেষ্টার দিকে তাকালাম।

: শুনতে কতক্ষণ মানে ?—কেষ্টা একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো : কোন লোক বদ্ধ কালা না হলে শ্যামনগরের পিসিমার কথা শোনে না এমন কথা হয় ? তাই তো কবিগুরু তোকে লক্ষ্য করেই বলেছেন : 'এ আমার এ তোমার পাপ' ; অর্থাৎ কিনা তোর পাপ তুই পিসিমার নাম শুনিস নি আর আমার অপরাধ আমি তোকে শোনাই নি !— বলতে বলতে কেষ্টা যেন অভিভূত হয়ে পড়তে চাইলো।

আমি বললাম : আমায় ক্ষমা কর কেষ্টা, আর এমন অপরাধ আমি জীবনেও করবো না। বল, তোর পিসিমার গল্প শুনি—

পিসিমার গল্প শুনতে চেয়ে যেন একটু উৎসাহিত করলাম কেষ্টাকে। ও বললে : বলছি দাঁড়াও—আগে শ্যামনগরটা কোথায় তোকে ভালো করে বুঝিয়ে দিই, তারপর শ্যামনগরের বিখ্যাত কুট্টিপিসির কথা বলবো। বলেই আমার মুখের সামনে একটা খবরের কাগজের মতো মস্ত ম্যাপ মেলে ধরলো। তাতে লাল নীল হলদে পেন্সিলে কি রকম সব ছক কাটা—আর ম্যাপটার চেহারাটা ঠিক চিচিঙের মতো ; গায়ে জেব্রার গায়ের মতো লম্বা লম্বা ডোরাকাটা।

আমি বললাম : এটা কী ? চিচিঙের ছবি নাকি ?

: ম্যাপ, গোবরগণেশ, ম্যাপ! এই ছাখ শ্যামনগর!—বলেই কেমন যেন অঙ্কের মাস্টারের মতো কঠিন মুখ করে তিলের নাড়ুর মতো শক্ত কট্‌কটে একরকম হাসি হাসতে লাগলো।

আমি ভীষণ আপত্তি করে বললাম: হতেই পারে না—এটা কোন ম্যাপই নয়; এটা কাকামণির ডাক্তারি বই-এর পাতা, পায়ে গোদ হলে এমনি হয়—তারই ছবি।

: কী বললি?—কেষ্টা চিৎকার করলো।

আমি বললাম: রাগ করলে কী হবে—কথাটা সত্যি। বিল্টুমামার শ্বশুরবাড়ীই তো শ্যামনগর। সে শ্যামনগরের চেহারা তো এমন খারাপ না—সেখানে স্টেশনে কত আলু-কাবলি বিক্রি হয়, কত চানাচুর, ঝাল মুড়ি, পাপর ভাজা বিক্রি হয় রথের দিনে, আমরা কিনে খাই।

: থাম। কত যে বাজে বকতে পারিস—তারা বাজে শিবপুরের লোক কিনা তাই ভালো কথা তোদের ভালো লাগে না। এটা অন্য রকমের শ্যামনগর, আফ্রিকার জঙ্গলের পাশে একটা ব দ্বীপের মতো জায়গায় এটা অবস্থিত।—এই বলেই আমার পৈতেতে পাওয়া কলমটা দিয়ে খস্‌খস্ করে লিখে দিলে—'শ্যামনগর—কুট্টিপিসির বাড়ী'। তারপর ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাবার মতো হাতে একটা ভ্যারেণ্ডার ডাল নিয়ে সেই লাল পেন্সিলের লেখাটার ওপর রেখে বলতে লাগলো: কুট্টিপিসি শ্যামনগরের লোক, কিন্তু অত্যন্ত সাহসী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিকারের—কি বলে ওই একটা ঝোঁক ছিল। বাড়ীর সবাই তাঁকে বলতো, বড়ো হয়ে ও আর একটা কেউকেটা না হয়ে যায় না।

: যত সব বাজে কথা—আমি চটে গেলাম।

: আরে আগে শোন না। আজকের দিনে কোন কথা আর অসম্ভব বলে মনে হয় কারুর? কুট্টিপিসির যে কী ভীষণ যোগ্যতা ছিল

শিকারের তা তোকে বর্ণনা করে বলা যাবে না। শুনে তুই তাজ্জব বনে যাবি। কুট্টিপিসিমা খপ্-খপ্ করে ঝাঁটা দিয়ে দাঁড়কাক পাতিকাক ধরে ফেলতেন আর তাদের খাঁচায় বন্ধ করে রেখে নানা রকম ছড়া, রাধাকেষ্ট এসব শেখাতেন।

একদিন হলো কি পিসিমা একটা কাককে ধরে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়াতে লাগলেন। সেই কাকটার আবার মনটা বড়ই নরম ছিল। আর ওর ঠাকুরদাদা এক ভদ্রলোকের ঠোঙা থেকে পচা হালুয়া খেতে গিয়ে কি করে ধরা পড়ে যায় আর তাদের বাড়ীর ছোট ছেলে নেপ্লে ওর নাকে সিগারেটের টিনের খাপ ফুটো করে লাগিয়ে দেয়। সেই থেকে মনের কষ্টে বায়স-সন্তান মারাই গেল।

ওর বাবা ছিল কবি। সারাদিন ইলেক্ট্রিকের তারে বসে গান ইত্যো গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে—ক—অ—ক খাবার।

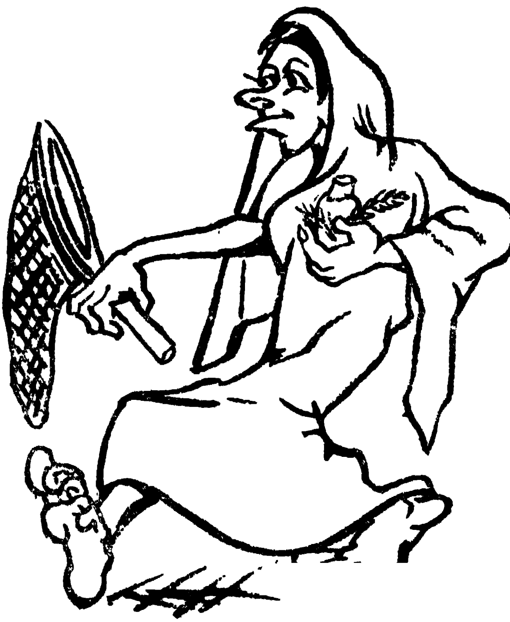
একদিন গান গাইতে গাইতে যেই সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে আর তখন একটা ঢিল টপ্ করে ওর মাথায় এসে পড়লো। মাথা ঘুরে গেল। চোখে কালো দেখলে। আর এক লহমার নজরে পড়লো কিষণ মুদীর ছেলে ঝগড়ু দাঁত বের করে হাসছে। ওর পিতা কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বর্গীয় হলো।

কাজেই সেই পিসিমা আরম্ভ করলেন, 'মেঘনাদ-ধাত্রী নামে প্রভাসা রাক্ষসী'—অমনি হার্টের অসুখের রোগী বায়সপুঙ্গব একে একে 'ফাইন্ড গেট'—মানে পঞ্চত্ব পেল।

যাই হোক, এতেই তুই কুট্টিপিসির সাহস আর ক্ষমতার নমুনা পেলি। এখন হয়েছে কি—শ্যামনগরের চারদিকে ভীষণ জঙ্গল, সে তো তোকে আগেই বলেছি। আর কাকটা মরে যাবার পর যেন পিসিমা কেমন উদাস উদাস হয়ে গেলেন। বললেন—এইটেই প্রকৃত স্থান। আমি জীবের সেবায় জীবন দেব। এইখানেই আমি ওদের জন্যে একটা হাসপাতাল করবো।

এই পর্যন্ত বলেই কেষ্টা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল, বললে : থাক, এ গল্প আর বলবো না।

: তার মানে ? বল না, আমি তো চুপ করেই শুনছি।



কেষ্টা ভ্যারেণ্ডার ডালটা মুখের মধ্যে দিয়ে খানিকটা বুরবুরি বের করলো : তারপর বললো : ওষুধ তৈরী করবার জন্যে কুট্টিপিসির সে কি পরিশ্রম ! সংগ্রহ করলেন—হিমালয়ের বরফের থেকে মুনাল পাখীর পালক, জঙ্গল থেকে ধনেশ পাখীর তেল, বাঘের দাঁত, গণেশ পাখীর ঠোঁট, শঙ্কর মাছের লেজ। আর সঙ্গে সঙ্গে অক্লান্ত খেটে চললো বেন্দা কবরেজ। তার উৎসাহ আর চেষ্টা তোকে আর কী বলবো !

হাসপাতাল খুলেই বিভ্রাট। রোগী পাওয়া যায় না। কি

বলবো ভাই তোকে ! বাঘের ম্যালেরিয়া, জেব্রার পাইওরিয়া, ব্যাঙের সর্দি—কিন্তু হাসপাতালের নাম শুনেই সব পালায় ।

বেন্দা কবরেজ সামনে ক্যানেস্তারা পিটে পিটে হাসপাতালের গুণ বর্ণনা করছে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা মানে কি জানিস ? কাক এবং



অশ্ব মানে ঘোড়া পড়ে পড়ে বেদনায় ভুগতে লাগলো, তবু কেউ হাসপাতালে এলো না । দেখ, কি বেইমান জাত ওরা ।

শেষে কুট্টিপিসি পায়ে টায়ারের চটি আর হাতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে চললেন । তাঁকে দেখেই জলের লম্বা ঠ্যাংওলা পাখীরা চেঁচিয়ে সব পাখীদের উড়িয়ে দিচ্ছে, আর ফেউগুলো বাঘের খবর মানুষকে জানিয়ে দেওয়া দূরে থাক, চিৎকার করে বাঘদেরই তাড়িয়ে দিচ্ছে ।

এবার কুট্টিপিসি ভীষণ মুস্কিলে পড়লেন।

এই কথা বলে যেন কুট্টিপিসির সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টাও বিপদে পড়েছে এমনিভাবে খানিকটা চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিলে; তারপর বললে: জানিস, আমাদের পাড়াটা বস্তিপাড়া?

আমি বললাম: তার সঙ্গে গল্পের কি যোগ?

: আছে রে আছে—বলেই কেষ্টা যেন কী একটা জিনিস পেয়েছে এমনিভাবে বললে: আমাদের পাড়ায় গরমের সময় খুব কলেরা আর বসন্ত হয়। কিন্তু বস্তির লোকেরা মরে গেলেও টিকে নেবে না। বলে কয়ে অনুরোধ করে, ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে এসব রোগের পরিণাম জানিয়েও যখন কিছুতে এদের টিকে নেওয়ানো যায় না তখন করপোরেশন একটা মজা করে। একটা গাড়ী আসে একদিন সুন্দর রোদ ফুটফুটে সকালে। তাতে ভারী সুন্দর সুন্দর গান বাজছে—এই ধর 'জুতো হ্যায় জাপানী' বা 'আমি সাঁঝের বলাকা—আ—আ-আ!'

এই গান শুনে যেই না বস্তির ছেলেবুড়ো ইঁদুরের গর্ত থেকে ছুটে গাড়ীর কাছে আসে আর গাড়ীর পেছনেই লুকিয়ে থাকে বেশ মোটসোটা ক'জন লোক। যেই ওরা গান শুনতে এসেছে আর যায় কোথায়, সবাই মিলে আষ্টেপিষ্টে ধরে—আর পুট-পুট করে লাগিয়ে দেয় ইনজেকশন।

কুট্টিপিসিও শেষে না পেরে ভেবেচিন্তে এই পথই নিলেন। হাসপাতালের সামনে বসে বসে ক্যানেস্তারার শব্দে বেন্দাকে নিয়ে সবাই পালিয়ে গেল। কেউ এলো না। কুট্টিপিসি কত সুন্দর করে গাইলেন তবু সবাই লেজ তুলে ছুটে পালালো।

কুট্টিপিসি দেখলেন, এতে হবে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সারারাত আর সারাদিন ধরে পরামর্শ করলেন, তারপর সেই যে ঈশপের গল্পে আছে একটা বাঘের গলায় কাঁটা ফুটেছিল—ঠিক

সেই বাঘটা কোথায় আছে, ভীষণভাবে তাকেই খুঁজতে লাগলেন।

তোকে আগেই তো বলেছি কুট্টিপিসির ভীষণ সাহস, তাই কুট্টিপিসি একাই জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। তারপর সারা জঙ্গল একেবারে তোলপাড় করে তুললেন। কিন্তু কারুকে পাওয়া গেল না।

কিন্তু পিসি বলে পিসি—যাকে বলে কুট্টিপিসি—সে রাতে লুকিয়ে রইলেন হাসপাতালের পেছনে। আর বেন্দা কবরেজকে কোত্থেকে একটা বাঘের চামড়া পরিয়ে সুন্দর বাঘ সাজিয়ে একটা বাবলাতলায় গম্ভীরভাবে বসিয়ে রাখলেন।

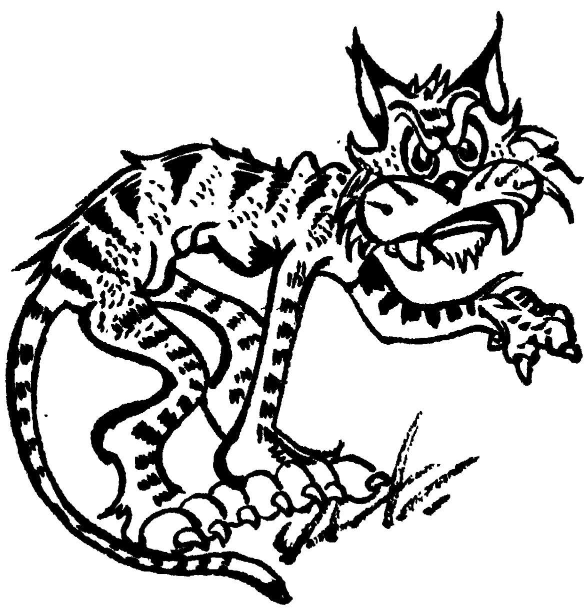
বেন্দা তো আর কুট্টিপিসি নয় যে, তার বুকে এতটুকুও ভয় নেই! সে ভীষণ ভীতু। এত ভীতু যে শেয়াল দেখলে মূর্ছা যায়। কিন্তু কী হবে, চাকরি যখন নিয়েছে তখন করতেই হবে। তাই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বসে রইলো বাবলাগাছতলায়।

এদিকে পায়ের তলায় অসংখ্য সুড়সুড়ি পিঁপড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কানের কাছে কী রকম সব পোকারা কুট্‌কুট্‌ করে কামড়াতে চেষ্টা করছে আর জোঁকেরা নানা রকমভাবে ভয় দেখাচ্ছে। বেন্দা কবরেজের মন ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এমনি সময় একটা বিচ্ছিরি বিকট সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে এলো বেন্দার। আর সঙ্গে সঙ্গে পেটের পিলের মধ্যে গুড়গুড় আওয়াজ করতে লাগলো। সেই ঈশপের গল্পের ঘেয়ো পচা বাঘটা গুটি-গুটি আসছে গোপনে তাদের হাসপাতালের আর কুট্টিপিসির খবর নিতে।

এসে পড়ছে বাঘটা বেন্দার কাছে। নাকে তীব্র পচা গন্ধ লাগছে, কিন্তু কি আর বলবো, তখন বেন্দার যে কী দশা তা চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাঘটা যখন প্রায় এসে পড়লো বলে, ঠিক তখন একটা বিচ্ছিরি পোকা বেন্দার নাকের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলো, বেন্দা তাকে সরিয়ে পর্যন্ত দিতে সাহস করলো না।

বাঘটা কাছে এলো, বেশ গুটি মেরে একটা ইট পেতে বসলো, তারপর বললে—'হাসপাতাল দেখছো বুঝি ? আমিও দেখতে এলাম।' —বলেই নাকে নস্যি দিলে। পকেট থেকে লিচুপাতার চশমা বের করে চোখে দিয়ে বললে—'তোমার কি মনে হয় কুট্টিপিসি ভালো লোক ? আমার তো তা মনে হয় না। দেখো না, সাইন বোর্ডে কি



লিখেছে'—বলেই সাপের খোলসের মধ্যে একগাদা জোনাকী পোকা টর্চ লাইট সাইন বোর্ডে ফেলে বললে—'দেখো আমার ছবিই এঁকেছে। মানে লক্ষ্যটা ঠিক আমার দিকেই। কেন, এর মানে কী ?'—বলেই সে তার খাগের কলমটা ঠোঁটের ওপর ঠুকতে লাগলো।

বেন্দা যে কী বলবে ভেবে পেলো না। শুধু রথের মেলার হুঁকো হাতে করা বুড়োর মতো মাথা নাড়তে লাগলো।

'দেখো, আমার ছেলেমেয়েরা সুন্দরবনে, গিন্নী আর আমি এখানে

থাকি। ভুগছি বটে অনেকদিন দাঁতের ব্যথায়—হাতে ঘা, তবু কুট্টিপিসির হাসপাতালে যাবো না। ওর কম্পাউণ্ডারটা কেশো রুগী।'—বলতেই বেন্দা কাঁপতে লাগলো।

'জ্বর এলো বুঝি? আসবেই তো। যা মশা এধারে।' বলেই বাঘটা একটু নড়ে বসলো। তারপর বললে—'ওর কম্পাউণ্ডারটাকে যদি পাই অমনি চিবিয়ে খাবো আর ওর টিকিটা দিয়ে আমার ছোট মেয়ের চুল-বাঁধা ফিতে বানাবো।'

যেই না বলা বেন্দা একেবারে ফ্যাঁচ্ করে এক বিকট হাঁচি—আর একবার হাঁচি এলে বেন্দা একটা দেবে না—একেবারে বিশটা দিয়ে ছাড়বে।

এক হাঁচির শব্দে পিঠের থেকে বাঘের ছাল খসে পড়লো আর—'ওরে পিসি রে'—বলে বেন্দা দিলে এক চিৎকার!

বাঘটা প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর ভীষণ রেগে গিয়ে যেই গর্জন করে বেন্দার ঘাড়ে পড়বে বলে লাফ দিয়েছে অমনি প্রজাপতি-ধরা জালে সশব্দে আবদ্ধ—তারপর পিসি টোয়াইন সুতো দিয়ে সজোরে বাঘের লেজ বেঁধে তাকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন। বাঘ তো একেবারে বস্তার মতো ছেঁচড়ে চললো। কুট্টিপিসি তাকে হাসপাতালে নিয়ে একেবারে বেডে শুইয়ে দিয়ে পড়্-পড়্ করে সাঁড়াশি দিয়ে নড়া দাঁত ক'টা তুলে সেখানে কয়টা বাঁধানো দাঁত লাগিয়ে দিলেন, তারপর হাতে কী যেন কী লাগিয়ে বেঁধে দিলেন।

তারপর বাঘ যেই যন্ত্রণায় চেঁচায় পিসি অমনি মুনাল পাখীর পাখা দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। বেশী যন্ত্রণা হলে নাকে ইভ্নিং ইন প্যারিসের শিশি ধরেন। বাঘেদের ওটাই ক্লোরোফরম।

বলবো কি, সাতদিনের মধ্যে বাঘ একেবারে কিয়োর। আর বললে বিশ্বাস করবি না, কুট্টিপিসির সেই হাতযশে এখন আর হাসপাতালে জায়গা নেই। একেবারে ভরা। আর সেই বাঘটা?

পিসির দরজায় ঘোড়ার মতো বাঁধা থাকে। রাত বিরেতে যখন দূরের জঙ্গলে কল আসে—পিসি তখন সেই বাঘের পিঠেই যাতায়াত করেন। আর বাঘিনীর পিঠে থাকে ওষুধের বাক্স ইত্যাদি। বললে হয়তো বিশ্বাস করবি না, সেদিন কুট্টিপিসি বাঘের পিঠে চড়ে আমাদের চুটিয়াপাড়ার বাড়ীতে এসেছিলেন। দেখে সবাই তো অবাক। পিসি বললেন—'বাচ্চু এতটা পথ এসেছে, কিছু খেতে দাও।'

আমরা তো ভাবছি, এখন কী দিই।

বাঘটা বললে—'আজ তো একাদশী কুট্টিপিসি, আমি তো কিছুই খাবো না। তা ছাড়া স্নান, পূজো-অর্চনা না করে তো জলগ্রহণ করি না আমি, তা তো তুমি জানো।'

কুট্টিপিসি বললে—'ঠিক বাচ্চু, আমার ভুল হয়ে গেছে—আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

আমি বললাম : সব বাজে কথা। এসব বানিয়ে বানিয়ে যা তা বলছো।

: তবে এতক্ষণ শুনতে চাইছিলি কেন ?—এসব গল্প তোর মতো গোবরগণেশদের জন্যে নয়। যারা জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করে তারা এর মর্ম বুঝবে। যদি শুনতো আমাদের খুতকুন কাকা তাহলে বুঝতো, হ্যাঁ—কুট্টিপিসি কি দরের মানুষ। তোর কাছে শুধু বকেই মরলাম, যশ পেলাম না।—বলেই কেষ্টা ভীষণ চটে স্টেশনের দিকে চলে গেল।